সেরা গল্প সিরিজ (২)

ইতালীর সেরা গল্প

অনুবাদক
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

বুক ষ্ট্যাণ্ড
১৷১৷১এ, বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক : শৈলবিহারী ঘোষ

বুক ষ্ট্যাণ্ড

১।১।১এ, বঙ্কিম চাটার্জ্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা

প্রচ্ছদপটে রূপ দিয়েছেন—

শিল্পী—অনাথবন্ধু সেন

প্রচ্ছদপট

ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

প্রথম সংস্করণ

অক্টোবর ১৯৪৫

দাম—আড়াই টাকা

প্রিণ্টার—পরমেশ্বর কর

ভাগবত প্রেস

৩৪, হরমোহন ঘোষ লেন

কলিকাতা

প্রখ্যাতনামা কথা-শিল্পী

শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

ভূমিকা

ইটালীর কয়েকজন বিখ্যাত গল্প লেখকের গল্প শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু এই বইতে তর্জমা করেছেন। তাঁর এই সাধু প্রয়াসের জন্যে তাঁকে আমি অভিনন্দিত করছি।

বিজ্ঞানের কল্যাণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আগেকার সেই দূরত্ব ও ব্যবধান এখন আর নেই। আগেকার সেই সুদূর রোমরাজ্য এখন আমাদের বাড়ির কাছের দেশ বললেই চলে,—আকাশে কতক্ষণেরই বা পথ! যেমন রাজনীতি—অর্থনীতি, তেমন সংস্কৃতির দিক থেকেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। আজ যদি আমরা আমাদের বাণী-মন্দিরের বাইরের দিকের জানালাগুলো বন্ধ ক'রে রাখি তাহ'লে আত্মহত্যার মতোই ভুল করব। আমাদের উদ্যম এখন শুধু মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে নিবদ্ধ রাখলেই চলবে না। সেই সঙ্গে বাইরের সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে। অন্য দেশের সাহিত্য এবং চিন্তাধারা কোন পথে চলেছে এও আমাদের জানতে হবে।

এই কাজটা এতদিন আমরা ইংরিজির মারফৎ চালিয়ে আসছিলাম। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্য ইংরিজিতে তর্জমা হয়েছে। সেই তর্জমা প'ড়ে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের আস্বাদ গ্রহণ করেছি। রবীন্দ্রকুমারও সেই ইংরিজি অনুবাদ থেকেই বাংলায় অনুবাদ করেছেন ব'লেই মনে হয়।

এর অনেক অসুবিধা আছে।

ইংলণ্ডের সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পরিবেশগত, সংস্কৃতিগত এবং ভাষাগত একটা মিল রয়েছে। হিন্দি অথবা গুজরাটি গল্প বাংলায় অনুবাদ করা যেমন কঠিন নয়, ফরাসী কিম্বা ইটালীয় সাহিত্যও ইংরিজিতে অনুবাদ করা তেমনি কঠিন নয়। কিন্তু মূলের রস অক্ষুণ্ণ রেখে ইটালীয় সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করা অত্যন্ত কঠিন। এই দুরূহ কার্য্যে আমাদের কেবল এইটুকু সুবিধা আছে যে, দীর্ঘ কালের সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে ইংরিজির সঙ্গে বাংলা ভাষার একটা সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ইংরিজি আমরা প্রায় মাতৃভাষার মতো ক'রেই আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছি এবং আমাদের ভাষার কাঠামোতেও ইংরিজির ছাপ পড়েছে গভীর।

সেই সুবিধা রবীন্দ্রকুমারেরও আছে এবং তাকে তিনি ষোল আনার উপর আঠারো আনা কাজে লাগিয়েছেন। ইটালীয় সাহিত্যের সূক্ষ্ম রসগ্রহণের শক্তি তাঁর আছে। নিজে তিনি উঁচু দরের সাহিত্য-রসিক। যে রস তিনি নিজে পরিপূর্ণ ক'রে গ্রহণ করেছেন, অন্যের কাছে অবিকল তা পরিবেশন করার অসামান্য শক্তিও তাঁর আছে। তাই অনুবাদ এত সুন্দর হয়েছে। বিদেশীয় পরিবেশের যে বিজাতীয়তা, সুন্দর ভাষায় তার খোঁচগুলি তিনি চমৎকার পালিশ ক'রে দিয়েছেন। পড়তে-পড়তে মনে-মনে তাঁকে বহুবার বাহবা দিয়েছি।

তাঁর লেখনী অজস্র ধারায় এমনি সুমধুর রস পরিবেশন করুক এই প্রার্থনা করি।

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

সূচী

তুষারপাত

কালো-কালো মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন। বাতাস বইছে। বইছে হু-হু ক'রে। অসম্ভব শীত। বাতাসের সঙ্গে একটা শীতলতা আসছে ভেসে। এতো ঠাণ্ডা যে, দেহের সমস্ত হাড়গুলি কেঁপে-কেঁপে ওঠে। এমনি যখন বিশ্রী প্রভাত, তখন কিসের আকর্ষণে, এই ন'টার সময়, সিনর আডোয়ারডো তাঁর অধ্যয়ন কক্ষের বাতায়নের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছেন? নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে—তিনি 'সযৌবন, শক্তিসম্পন্ন সতেজ ব্যক্তি। কারো স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঈর্ষান্বিত হওয়া কখনো যুক্তিসঙ্গত নয়। সিনর অডোয়ারডোর বাতায়নের বিপরীত ভাগে, সিনোরা ইভ্‌লিনার জানালা। এঁরও অডোয়ারডোর মতোই নিজের জানালায় দাঁড়ানো অভ্যাস আছে। আজো সেই অভ্যাসের কোনো ব্যতিক্রম দেখা গেলো না। ইভলিনা ঘরের জানালাটার ওপর নিজের দেহের ভার ন্যস্ত ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁর কুঞ্চিত কেশদাম বাতাসের দাপটে ললাটদেশে আছাড় খেয়ে পড়ছে। এবং সেই বিক্ষিপ্ত কুঞ্চিত কেশ, মাঝে-মাঝে মাথার ঝাঁকুনি দিয়ে ললাট থেকে সরিয়ে দেবার বৃথা চেষ্টা করছেন। দু'-জনের বাড়ীর মাঝখান দিয়ে একটা অপরিসর রাস্তা। কাজেই 'ঐ দুই বাড়ীর বাতায়নে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির সঙ্গে স্বচ্ছন্দেই বাক্যালাপ ক'রতে পারেন।

অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ইভ্‌লিনার স্বামী মৃত; এবং এঁর সৌন্দর্য্য অনুপম। শুধু অনুপম নয়, সৌন্দর্য্য মাদকতায় পূর্ণ। ওঁর দেহের কমনীয়তা এমনি যে, নারীর মনেও লালসার উদ্রেক করে। মাথার কেশ সোনালী। গায়ের রং ঠিক দুধে-আলতা। সরল নাক। চুম্বন করার উপযোগী ওষ্ঠদ্বয়ের ভেতর চমৎকার শাদা ধব-ধবে দাঁতের সারি। চোখ দু'টি ঠিক্ মেঘশূন্য নীলাকাশের মতো। অনন্যসাধারণ দু'টি চোখের সদ্ব্যবহার তাঁর অজানা ছিলো না। বয়স মাত্র চব্বিশ। কিন্তু ঈশ্বরের কী অবিচার দেখুন। এই তুলনাহীন সৌন্দর্য্য নিয়ে, এতো অল্প বয়সে সে বিধবা! সত্যি কথা ব'লতে কি, এঁর চরিত্রের একটা সবলতার ভাব বিদ্যমান। তাঁর স্বামী গত হবার পর মাত্র ছ'টি মাস কেটে গিয়েছে। এটা সুখের বিষয়, নিশ্চয়ই সুখের বিষয় যে, ইভ্‌লিনা সংসারে জড়িত হয়ে পড়েন নি। না পড়ার একটা কারণও আছে। স্বাধীন, ছেলেমেয়ের বালাই নেই। কিন্তু আমাদের দৃঢ় ধারণা, তিনি তাঁর এই ভরা যৌবন, অনন্যসাধারণ রূপরাশি এবং সীমাহীন মাদকতা নিয়ে দ্বিতীয় স্বামী লাভ ক'রতে পারেন অনায়াসে। ফলতঃ এটা দোষস্থ হবে না, যদি এটা স্বীকার করা যায় যে, ইভ্‌লিনা দ্বিতীয় বার বিয়ে করবার অভিলাষ মনে-মনে পোষণ করেন। এই প্রসঙ্গে এটা ব'লে রাখা ভালো, সিনর অডোয়ারডোর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল, এবং তিনিও বিপত্নীক।

কী আশ্চর্য্য সমন্বতা!

কিন্তু তাঁরা দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন না কেন?

তুষারপাত

সিনর অডোয়ারডো এখনো কিছু স্থির ক'রতে পারেননি। যদি প্রেম-সংক্রান্তের খারাপ কিছু ঘটতো, তা'হলে আমার মনে হয় এই অস্থিরতা ইতিপূর্ব্বেই অপসারিত হয়ে যেতো! কিন্তু সিনোরা ইভলিনার অভিরুচির মধ্যে মৌলিকতা আছে। তিনি দ্বিতীয় বারের জন্যে স্বামীর খোঁজ ক'রছেন। সত্যিকারের স্বামী চান তিনি। প্রতারণা কখনো ভুলেও কামনা করেন না। পুরুষের মাথা খারাপ ক'রে দেবার অনেক কিছু কলা-কৌশল তাঁর জানা। কিন্তু নিজে অনুক্ষণ ঠিক্ থাকেন। এটা বড়ো কম শক্তি নয়। পরের মাথা ঘু'রিয়ে দিয়ে নিজে খাঁটী থাকা, চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য বৈকি! নিজের স্বার্থসিদ্ধির দিক দিয়ে ধরতে গেলে, সিনোরা ইভলিনা অত্যন্ত সতর্ক; এ'কথা ব'লতেই হবে।

সিনর অডোয়ারডোর পাঠাগারের জানালার বিপরীত দিকে, কক্ষের প্রবেশ পথের দরজা। সহসা সেই দরজা সশব্দে ঠেলে একটি আট-ন' বছরের বালিকা প্রবেশ ক'রলো। এই মেয়েটির নাম—ডরেটা।

ডরেটা সুমিষ্ট স্বরে তার পিতাকে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লো, আমি ইস্কুলে যাচ্ছি বাবা।

—এসো ডরেটা। এই ব'লে তিনি স্মিতহাস্যে কন্যার মুখচুম্বন ক'রলেন। ঠিক সেই সময়ে সিনোরা ইভলিনা ওদিকের জানালা থেকে ব'লে উঠলেন, সুপ্রভাত ডরেটা!

ডরেটা ঘরে প্রবেশ মাত্রই লক্ষ্য ক'রেছিলো, ঐ সুন্দরী ইভলিনাকে তার পিতার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রতে। সে বিরক্তি এবং অনিচ্ছার সঙ্গে অস্ফুটে ব'ল্লো, সুপ্রভাত।

এই ব'লে বালিকাটি হাতে একটা ছোটো ব্যাগ নিয়ে হলঘরে নেমে আসে। এখানে তার জন্যে পরিচারিকা অপেক্ষা করে।

ইভ্লিনা একটা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে ব'ল্লেন, মেয়েটিকে আমি কতোই না ভালোবাসি! কিন্তু আমার নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে, ও আমাকে একেবারেই দেখতে পারে না।

—কী অদ্ভুত ধারণা আপনার! ডরেটা যে অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মেয়ে। ওর মনে কখনো এ-ভাব আসতে পারে না। আর যদিও বা আসে, সেটা থাকে না বেশিক্ষণ।

সিনর অডোয়ারডো এ'কথা প্রতিবাদচ্ছলে ব'ল্লেন বটে, কিন্তু উনি বেশ ভালো ক'রেই জানেন, তাঁর কন্যার কোনো আসক্তিই নেই সিনোরা ইভ্লিনার প্রতি।

ইত্যবসরে বায়ুর শীতলতা অধিক থেকে অধিকতর হয়ে উঠছিলো। তুষারপাতে চতুর্দ্দিক শাদা। জানালা বন্ধ ক'রে রাখা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

উর্দ্ধপানে দৃষ্টিপাত ক'রে সিনোরা ইভ্লিনা ব'ল্লেন, বরফ পড়ছে!

—হ্যাঁ, এখুনি হয় তো ঘরের ভেতরে এসে পড়বে।

—আচ্ছা, এখন চ'ল্লাম। ঘরের কাজকর্ম্ম বাকী আছে। বিদায়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আবার দেখা হয়। পরে আপনার দেখা পাবো?

—আশা তো ক'রি।

—আচ্ছা, আসি তবে!

এই বলে সিনোরা ইভ্লিনা জানালাটা বন্ধ ক'রে দেন। এবং পরক্ষণেই আনত মুখে একটা সরল হাস্য-রেখা ওষ্ঠের ওপর টেনে

এনে, তখুনি অদৃশ্য হয়ে যান। এটা অডোয়ারডোর চোখে ধরা পড়তে বিলম্ব হলো না। দরজার ভেতর দিকে স্বচ্ছ, পরিষ্কার শার্সি। এর মধ্য দিয়েই তিনি ইভ্‌লিনার মুখের হাসি দেখতে পান।

অডোয়ারডো জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে পাঠে মনোযোগ দেবার চেষ্টা ক'রলেন। কিন্তু অত্যন্ত শীত বোধ হওয়ায় তিনি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিমুখে আরো খান কয়েক কাঠ গুঁজে দিলেন। দিয়ে পুনশ্চ চেয়ারখানা টেনে নিয়ে অধ্যয়ন ক'রতে সুরু ক'রলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার! উনি ম[illegible]ক অশান্ত হয়ে উঠেছেন। তাই আসন ত্যাগ ক'রে ক্ষণকালের মধ্যেই কক্ষের ভেতর পায়চারী আরম্ভ করেন। সিনর অডোয়ারডো গভীর চিন্তায় নতমস্তকে পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঠিক্ হায়নার মতো ঘুরছেন। তাঁর মনে হ'তে থাকে—তিনি তাঁর জীবনের এক বিপদ সঙ্কুল পথে পা দিয়েছেন। এবং বোধকরি কয়েকদিনের মধ্যে, চাই কি কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই, তাঁর ভবিষ্যৎ নিরূপিত হয়ে যাবে। ইভ্‌লিনার কি তাঁর মৃতা স্ত্রীর মতো চমৎকার স্বভাব? ডরেটার মার অভাব তিনি কি পূরণ ক'রতে পারবেন?

হলঘরে কার যেনো পদশব্দ। সিনর অডোয়ারডো কক্ষের মধ্যপথে অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর কক্ষদ্বার সহসা উন্মুক্ত হলো—ডরেটা প্রবেশ ক'রছে। মেয়েটির কচি কপোল দু'টি রক্তাভ।

—বরফ প'ড়ছে বাপী। সেই জন্যে আমাদের ছুটি হয়ে গেলো।

এই ব'লে ডরেটা মাথার টুপিটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে, আগুনের কাছে এলো।

—আগুন খুব রয়েছে। কিন্তু ঘরটা এতো ঠাণ্ডা! ডরেটা ব'ল্লো।

ডরেটা আগুন পোয়াতে পোয়াতে আবার ব'ল্লো, বাপী, আজ সমস্ত দিনটাই তোমার কাছে থাক্‌বো কিন্তু। হ্যাঁ, বাপী—নিশ্চয়ই থাকবো।

—কিন্তু তোমার এই বাপীর যদি কোনো জরুরী কাজ থাকে মা?

—না না, বাপী। ওসব শুনতে চাইনে! আজকে তোমার কোনো কাজই ক'রতে দোবো না।

এই ব'লে ডরেটা উত্তরের কোনো প্রতীক্ষা মাত্র না ক'রে তার বই, পুতুল নিয়ে আসবার জন্যে ঘর থেকে দৌড়েই বেরিয়ে গেলো। ফিরে এলো, মিনিট দুই পরে।

ডেস্কের ওপর বই বিছিয়ে এবং পুতুলটিকে পরমযত্নে সোফার এক পাশে বসিয়ে রেখে ডরেটা আনন্দে ব'লে উঠলো, বাঁচা গেলো বাবা, আজ ইস্কুল হলো না। পড়া হয়নি আজকের। পড়াটা ভালো ক'রে পড়বার সময় পেলাম বাবা! দেখো বাপী, কী রকম বরফ প'ড়ছে। দেখো, দেখো।

সত্যি চারিদিকে তুষারপাত হচ্ছে।

ঘরের বাইরে ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতা আছে। কিন্তু ভেতর দিকটা শীঘ্র উষ্ণ হয়ে উঠছিলো। একটা চেয়ারের ওপর আসন গ্রহণ ক'রে ডরেটা সন্তুষ্টচিত্তে জানায় যে, 'পারা' এতক্ষণে নিশ্চয় এগারো ডিগ্রিতে উঠেছে।

—হ্যাঁ, মা। কিন্তু দেখছো এগারোটা বেজে গেলো। শিগ্যির গিয়ে ওদের বলো, প্রাতঃরাশ তৈরী রাখতে।

তুষারপাত

ডরেটা পিতার আদেশ পালন ক'রতে দৌড়ে ঘরথেকে বেরিয়ে গেলো। কিন্তু তখুনি ফিরে এসে ব'ল্লো, বাপী বাপী—খাবার ঘর ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার।

—তাহ'লে, এখানেই আমাদের প্রাতঃরাশ আনতে বলো।

এই কথা শুনে ডরেটার, এতোটুকু মেয়ে ডরেটার, প্রাণটা আনন্দে নেচে ওঠে। সংবাদটা দিতে সে রান্নাঘরে ছুটে যায়। এবং কয়েক মি'নটের মধ্যে রান্নাঘর থেকে পড়বার ঘরে, পড়বার ঘর থেকে রান্নাঘরে ঘনঘন যাওয়া আসা ক'রে, তার নিজের হাতে ছুরি, কাঁটা, চামচ, ডিস্ টেবিলক্লথ এবং তোয়ালে নিয়ে হাজির করে। এরপর সেগুলি ভৃত্যের সাহায্যে তার পিতার টেবিলে গুছিয়ে রাখে।

সিনর অডোয়ারডো তাঁর কর্ম্মঠ কন্যার প্রতি চেয়ে আনন্দাতিশয্যে ব'লে ওঠেন, বাঃ, ডরেটা বাঃ!

ডরেটার আকৃতিটা ওর মাকে অনুসরণ ক'রেছে। এ বিষয়ে সকলেরই এক মত। ওর মা সুগৃহিণী ছিলেন। সৌন্দর্য্য ছিলো ডরেটার মতোই। কিন্তু সিনোরা ইভলিনার মতো তাঁর চমৎকার কেশ এবং মন ভোলান চোখ ছিলোনা।

ভৃত্যের আহার্য্য আনার সঙ্গে-সঙ্গে একটা নতুন জীব এসে ঘরে প্রবেশ করলো। মিলানিও,—বেড়াল মিলানিও। এই বেড়ালটা খাবার সময় হলেই যেখানেই থাকুক না কেন, এসে হাজির হবেই। এর বয়েস বার্দ্ধক্যের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। ডরেটাকে জানে—এই ধরার বুকে

আসার পর থেকেই ওকে জানে। প্রতিদিন ভোরবেলা মিলানিও এসে তার দরজায় মিউ-মিউ ক'রে ডাকে। ভাবটা এই যে, ডরেটা নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রা যাচ্ছে কিনা অনুসন্ধান নেওয়া। ডারেটার শয্যা গ্রহণ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে তার পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গ ছাড়ে না কখনো। হ্যাঁ—কখোনই সঙ্গ ছাড়ে না। এটা চোখে পড়েছে—ডরেটা কোথাও গেলে, মিলানিও নিস্তব্ধ পদবিক্ষেপে তাকে অনুসরণ করে। করে আস্তে নয়—দস্তুর মতো ক্ষিপ্রগতিতে। তারপর ও যখন ফিরে আসে, তখন বৃদ্ধ মিলানিও ওর পায়েব নিজের দেহের স্পর্শ দিয়ে কতো আনন্দই-না জানাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু মিলানিওর, বেড়াল মিলানিওর, সিনর অডোয়ারডোর পড়ার ঘরে আসা অভ্যাস ছিলো না। আজ হঠাৎ এই ঘরে আহার্য্যের পালা সুরু হতে দেখে, ওর মনে বোধকরি একটা বিস্ময়ের ছাপ্ পড়ে গেলো।

প্রাতঃরাশপর্ব্ব চুকে যাবার পর ডরেটা তেমনি ক্ষিপ্রগতিতে সব তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু মিলানিওর স্বভাবের এবার একটা ব্যতিক্রম দেখা গেলো। সে ওকে তো অনুসরণ করলোই না, উপরন্তু এক পা' এক পা' ক'রে গিয়ে ব'সলো আগুনটার পাশে। সিনর পুনশ্চ পাঠে মনোনিবেশ ক'রলেন। কিন্তু মন যাঁর নিয়ত সুমুখের সার্শিসম্বলিত জানালাটার প্রতি নিবিষ্ট, তাঁর অধ্যয়নে মনোসংযোগতা কী ক'রে আসতে পারে, আপনারাই বিচার করুন। আডোয়ারডো, সিনোরা ইভ্লিনার মুখছবি মানস-চক্ষে নিরীক্ষণ ক'রতে ক'রতে হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে হোঁচট্ খেলেন—না—অসম্ভব। ইভ্লিনার

বাড়ীতে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। এটা সত্যি যে মাঝখানে মাত্র একফালি পথ। কিন্তু ঘরের বাইরে এলেই তাঁকে তুষারের মধ্যে আত্মগোপন ক'রতে হবে। এখন, এই বারোটার সময়— তাঁর অতিবড়ো শত্রুও এ'কথা স্বীকার না ক'রে পারবে না। দেখা যাক্ পরে তুষারপাত বন্ধ হতে পারে তো!

কিছুক্ষণ পর—

ডরেটা তার পিতার ডেস্কের ওপর নত হয়ে কাগজ, কলম দিয়ে তার দিদিমাকে পত্র লিখতে ব'সেছে। অডোয়ারডো আগুনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে শরীর গরম ক'রতে ক'রতে মেয়ের রকম দেখে নিঃশব্দেই মৃদুমৃদু হাসছিলেন। ডরেটা কাগজের ওপর মাত্র দুটি শব্দ লিখেছে— প্রিয় দিদিমা।

বহু চেষ্টা ক'রেও ডরেটা এর বেশী লিখতে পারে না। গলদঘর্ম্ম হয়ে মাথা তুলে সিনরকে প্রশ্ন করে, দিদিমার নেমনতন্ন রাখতে— আমি কি লিখবো—বাপী?

—লিখে দাও, এখন তুমি যেতে পারবে না। আগামী বসন্তকালে তুমি তাঁব কাছে যেতে পারো।

—তোমার সঙ্গে তো বাপী?

অডোয়ারডো অন্যমনস্কে ব'ল্লেন, হ্যাঁ আমার সঙ্গেই। কিছুক্ষণ পর ডরেটা সানন্দে ব'লে উঠলো,—আমি শেষ ক'রেছি। কিন্তু এই আনন্দের সঙ্গে-সঙ্গেই একটা তীব্র বিরক্তির এবং ক্রোধের সুর ভেসে এলো।

—ব্যাপার কি?

—ব্লটিং পেপার—ব্লটিং পেপার কৈ ?

—দেখি, আমাকে দেখতে দাও তুমি কি করেছো !···এ—তুমি দেখছি চিঠিটা একেবারেই নষ্ট ক'রে ফেল্লে !

কাগজের ওপর কালীর ফোঁটা পড়াতে ডরেটা জিবের দ্বারা সেটা লেহন ক'রে নিতে গিয়ে, কাগজটাই ছিঁড়ে ফেলেছে ।

ডরেটা অপ্রতিভ-কণ্ঠে ব'ল্লো, চিঠিটা এখুনি আমি নকল ক'রে নিচ্ছি ।

—আচ্ছা সন্ধ্যের দিকে নকল করো। ওটা আমার কাছে দাও। চাবি দিয়ে রাখি···বা বেশ লিখছো তো ! তবে দু'-একটা কথা উঠিয়ে দিয়ে নতুন কিছু ওর বদলে বসাতে হবে। মোটের ওপর তোমার মতো ছোট্টো মেয়ের পক্ষে, এ সত্যি প্রশংসনীয়।

ডরেটা, এখন তার পুতুল নিনিকে নিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে ওঠে। নিনিকে সে ভালো ভালো পোষাকে সাজায়। সাজিয়ে মিলানিওর কাছে নিয়ে যায়।

বেড়াল মিলানিও, অর্দ্ধনিমিলিত চক্ষে শুয়ে শুয়ে ঝিমচ্ছে। এই আরামদায়ক তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটায় বাধা পড়ায় বোধকরি মনে-মনে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। নিজের চারটে থাবার ওপর ভর ক'রে উঠে দাঁড়ায়। নরম দেহটা ধনুকের মতো বেঁকিয়ে তৎক্ষণাৎ মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে পেছন ফিরে ডরেটার পানে দৃষ্টিপাত করে। ডরেটা ব'ল্লে, মিলানিওর স্বভাবটা আজ কেমন যেনো বদলিয়ে গিয়েছে বাপী—না ? এই ব'লে হাতের পুতুলটাকে ডরেটা সোফার ওপর শুইয়ে রাখলো।

তুষারপাত

সিনর অডোয়ারডো ব'ল্লেন, দুঃখ করো না ডরেটা। আমার মনে হচ্ছে—এর জন্যে এই বিশ্রী আবহাওয়াটাই দায়ী। ডরেটা, তোমার কি ঘুম আসছে ?

কিছুক্ষণ ঘরটা নিস্তব্ধতা অবলম্বন ক'রে রইলো। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ডরেটা। হঠাৎ নিজের একখানা বই নিয়ে একটা কবিতা পড়ে ব'লতে লাগলো ঠিক আবৃত্তির সুর ক'রে। কিন্তু পড়:তে পড়তে সে দু-চোখ তুলে দেখে, সিনর অডোয়ারডো অন্যমনস্কে অন্যত্র দৃষ্টি পাত ক'রে আছেন। এতে ঐ ক্ষুদ্র মেয়েটির অন্তরে নিদারুণ অভিমান আশ্রয় গ্রহণ ক'রলো। ডরেটা আর পড়েনা। বইখানা হাত দিয়ে সরিয়ে চুপ ক'রে গম্ভীর বিষণ্ণ মনে থাকে ব'সে।

আডোয়ারডোর এবার হুঁস হয়। বলেন, ডরেটা, চুপ্ ক'রে রইলে যে ? বেশ তো প'ড়ছিলে—পড়ো না ?

—না আমি প'ড়বো না। ব'য়ে গিয়েছে আমার প'ড়তে। কেন প'ড়বো আমি ?

—কেন মা কেন ? কী হলো তোমার ?

ডরেটা নিরুত্তরে নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। নিজের দু'-পায়ের আঙ্গুলগুলির ওপর ভরদিয়ে উঁচু হয়ে যা আবিষ্কার করলো, তাতে ওর বুঝতে বিলম্ব হলো না—কি হেতু ওর পিতা অন্যমনস্ক থেকে ওর পড়ায় মন দেন নি। তুষার পূর্ব্বের চেয়ে পাৎলা হয়ে এসেছে। এবং সিনোরা ইভ্লিনার মনোরম মুখখানি ওদিকের ভেজানো সার্শির মধ্যে দিয়ে এদিক পানে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। ইভ্লিনা বাতায়ন

উন্মুক্ত ক'রে একটা শাবল দিয়ে গোবরাটের গায়ে-লাগা তুষারকণা পরিষ্কার ক'রে ফেলছেন।

সিনোরা ইভ্লিনার চোখের দৃষ্টি ঠিক্‌রে এলো সিনর অডোয়ারডোর . । প্রতি। ফিক্ ক'রে হেসে ফেল্লেন। ওঁর চোখ যেনো সিনরকে ব'লতে চাইলো—ঈ কী বিশ্রী দিনটা!

অডোয়ারডো অকৃতজ্ঞ নন! উনি নিজের ঘরের ওদিককার জানালাটা উন্মুক্ত ক'রতে বিস্মৃত হলেন না। ইভ্লিনাকে প্রশংসা ক'রে ব'লে উঠলেন, ইভলিনা-বাঃ। আমি দেখছি, তুমি তুষারপাতের ভয়ও করো না।

—উঃ কী বিশ্রী দিন,—কী জঘন্য আবহাওয়া। কিন্তু আমি যেনো ডরেটাকে ওখানে দেখছি। কি ডরেটা, কেমন আছো?

আডোয়ারডো কন্যাকে উদ্দেশ্য ক'রে ব'ল্লেন, ডরেটা-এদিকে এসো। উ'ন যা' জিজ্ঞাসা করছেন, তার উত্তর দাও।

ইভ্লিনা এ'কথা শুনতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, না না! ওকে বিরক্ত ক'রবেন না।—বিরক্ত ক'রবেন না। আপনি জান্‌লা বন্ধ ক'রে দিন। বড্ডো বিশ্রী ঠাণ্ডা! ছেলে-মেয়েদের চট্ ক'রে সর্দ্দি-কাশি হ'য়ে যায়। আমার মনে হয়, আজ আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।

—রাস্তার অবস্থা একবার দেখুন!

—উঃ আপনারা কী স্বার্থপর। আচ্ছা চ'ল্লাম।

—আচ্ছা।

এক সঙ্গেই দুই বাড়ীর, দুই কক্ষের জানালা দু'টি সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু এবার ইভ্লিনা অদৃশ্য হলেন না। জানালা

সংলগ্ন একটা স্থান পরিষ্কার ক'রে নিয়ে উপবেশন করলেন। বরফ খুব পড়ছিলো। তুষারপাতে জানালার সার্শির ওপর ইভ্‌লিনার মুখের একপার্শ্বের ছায়া সুস্পষ্ট রূপে লেগে র'ইলো। সিনর অডোয়ারডোর চোখে সেটা ধরা প'ড়লো। হায়! হায়! ভগবান্ তুমি সিনোরা ইভ্‌লিনাকে জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য দিয়ে তৈরী করেছো!

সিনর অডোয়ারডো চিন্তাক্লিষ্ট মনে ঘরময় পায়চারি ক'রতে লাগলেন। তাঁর একবার মনে হলো,—সিনোরা ইভ্‌লিনার কাছে না যাওয়া একটা ভুলের ব্যাপার—দোষের ব্যাপার। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো—ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটাও পরম অপরাধের ব্যাপার। আজ সকালে ডরেটার মুখ কেমন বিষণ্ন হয়ে উঠেছিলো এখন ঠিক তেমনি হয়ে ওঠে।—এটা অডোয়ারডো বেশ উপলব্ধি করেন।

তিনি কন্যাকে হাত ধরে নিয়ে এলেন সোফার কাছে। নিজে তাতে উপবেশন ক'রলেন এবং ডরেটাকে কোলের ওপর বসিয়ে পরম স্নেহে ব'ল্লেন, আচ্ছা ডরেটা, তুমি ইভ্‌লিনার ওপর এতো চটা কেন বলোতো?

কিন্তু এই ক্ষুদ্র মেয়েটি সে কথার জবাব কোনো মতেই দিতে পারে না। ওর মুখখানি রক্তাভ হয়ে ওঠে। বেশ বোঝা যায়, সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

অডোয়ারডো পুনশ্চ ব'ল্লেন, কিন্তু সিনোরা ইভ্‌লিনা তোমার কাছে কী অপরাধ করেছেন,—মা?

—কিছু না, কিছু না। তিনি কোনো অপরাধ করেন নি।

—তবু তুমি তাঁকে ভালোবাসো না!

কিছুক্ষণ গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে অতিবাহিত হয়ে যায়।

—কিন্তু তিনি তোমায় কতো ভালোবাসেন!

—তাতে আমার কী? আমার কী তাতে?

—ছি! তুমি বড়ো দুষ্টু হয়ে উঠ্‌ছো। ইভ্‌লিনার কাছে তোমাকে যদি কিছু দিন থাকতে হয়—তা' হ'লে?

ডরেটা অভিমান পূর্ণ আর্দ্রস্বরে ব'ল্লো, না না, আমি তাঁর কাছে কিছুতেই থাকবো না।—কিছুতেই না।—কিছুতেই না।

অডোয়ারডো ডরেটাকে কোল থেকে নীচে নামিয়ে দিলেন। ভর্ৎসনা স্বরে ব'ল্লেন, তুমি বোকা। ভয়ানক বোকা তুমি। বোকার মতো কথা ব'ল্‌ছো কেন?

এই তিরস্কারে ডরেটা এবার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ফুলে-ফুলে উঠতে থাকে।

মাতৃহারা একমাত্র কন্যাকে—এই পরম স্নেহের কন্যাকে, এমনি-ভাবে রোদন ক'রতে দেখে সিনর আডোয়ারডো আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে ডরেটাকে নিজের দুই বাহু প্রসারিত ক'রে বুকের ওপর আকর্ষণ ক'রে নিলেন। এবং পরক্ষণেই তার পিঠের ওপর পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে-দিতে ব'ল্লেন, কেঁদোনা মা, কেঁদোনা। ছিঃ চুপ্ করো! আর তোমায় কখনো তিরস্কার ক'রবো না।

*　　*　　*　　*　　*　　*

সিনর অডোয়ারডো নিজের মুখখানি দু'হাত দিয়ে ঢেকে ব'সে আছেন। তাঁর মাথায় কতো প্রকারই-না চিন্তা ভিড় ক'রে উঠছে!

তুষারপাত

কতো গভীর ভালোবাসা, স্নেহই-না তাঁর বুকখানাকে আশ্রয় ক'রেছে! সিনোরা ইভলিনার মুখখানি যদি অন্তর থেকে মুছে ফেলা যেতো! কিন্তু কৈ—তাতো তিনি পারেন না! অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু সব চেষ্টাই তাঁর নিষ্ফল! ইভ্লিনার আকাশের মতো নীল স্বচ্ছ দু'টি চোখ, সেই প্ররোচনার হাস্য-রেখা—এ যে তিনি বিস্মৃত হতে পারছেন না। তাঁর ইচ্ছে হয়, এই মুহূর্ত্তেই সিনোরা ইভ্লিনাকে ছুটে ব'লে আসেন—ইভ্লিনা, তুমি আমার হও। আমার অন্ধকার ঘরে এসে আলোকমালায় সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত ক'রে তোলো। তোমার ভালোবাসায় আবার আমার জীবন নতুন আলোর সন্ধান পাক্। তোমার সঙ্গ পেলে আমার বয়েস দশবছর পিছিয়ে যাবে। এবং সেই সুখ-শান্তি উপলব্ধি ক'রবো, যে সুখ-শান্তি আমি উপভোগ ক'রেছিলাম, আমার জীবনের সেই প্রথম বিবাহিত-জীবনে।

এ পর্য্যন্ত চিন্তা ক'রে সিনর অডোয়ারডো একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রলেন।

মনে হয় সিনর অডোয়ারডোর অনেক যেনো পরিবর্ত্তন হয়েছে। সেই পূর্ব্বকার অডোয়ারডো এখন কোথায়? তাঁর মৃতা স্ত্রী, সিনোরা ইভ্লিনা থেকে কতো অংশেই-না বিভিন্ন ছিলেন! তাঁর স্ত্রী ছিলেন, নম্র, আভিজাত্য পূর্ণ। প্রেমের দিক দিয়ে তিনি সরল-প্রাণা বালিকার মতো! প্রতারণা, বঞ্চনা এবং কূটনীতি তাঁর অন্তরে কোনোদিন স্থান পায়নি! তিনি ছিলেন একাধারে কন্যা, ভগিনী, স্ত্রী এবং জননী। প্রথম দিকটা অডোয়ারডো তাঁকে নির্জ্জনেই ভালোবাসা জ্ঞাপন ক'রতেন। এবং সেই নির্জ্জনেই স্ত্রী স্বামীকে সেই ভালোবাসার

প্রতিদান দিতেন। একদা উদ্যানে পাশা-পাশি বিচরণ ক'রতে ক'রতে অডোয়ারডো স্ত্রীর একখানি হাত হৃদয়াবেগে ধারণ ক'রে তাতে চুম্বন-রেখা অঙ্কিত ক'রে দিয়ে ব'লেছিলেন, তোমাকে আমি কতো ভালোবাসি! এই কথা শুনে তাঁর স্ত্রী মার কাছে দৌড়েগিয়ে পরম উল্লাসে ব্যক্ত ক'রেছিলেন—আমি কত সুখী!

সিনর অডোয়ারডো জীবনের প্রথম গার্হস্থ্য প্রেমের মধ্যে দিয়ে, কবিত্ব-শক্তি অর্জ্জন ক'রেছিলেন। কতো সময়ে, কতো স্বরচিত কবিতাই-না তিনি স্ত্রীকে শুনিয়ে নিজের অন্তরের একনিষ্ঠ ভালোবাসা প্রকাশ ক'রেছেন। সংসার-পথে অনেক সময়ে সামান্য বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে তাঁদের দাম্পত্য-জীবনে কোলাহল সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সে কতক্ষণ? কতক্ষণ সেটা স্থায়ী হতে পেরেছিলো? মেয়াদ্ ছিলো তার এক মুহূর্ত্ত। সেই দাম্পত্য কোলাহলের অবসান হতো নিবিড় ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে। স্ত্রীর অশ্রু তিনি সযত্নে মুছিয়ে দিতেন। সমস্ত কোলাহলের অবসান হতো, গভীর চুম্বন রেখায়। হায়রে! কোথায় গেলো সেই সব দিন! সেই স্বর্গীয় আনন্দে-ভরা দিন গুলি?

কিন্তু ঐ ইভ্‌লিনা? না-না! তিনি পারেন না, কখনোই পারেন না—সিনর অডোয়ারডোর মনে সেই পূর্ব্বদিনের আনন্দ ফিরিয়ে আনতে। ঐ আত্মাভিমানী বিধবা, যিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর ছ'মাস পরে পুনরায় দ্বিতীয় স্বামীর সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত ক'রেছেন, তিনি পারেন না—কখনো পারেন না, অডোয়ারডো অন্তরে সেই বিগত দিনের নির্ম্মলানন্দের ধারা বহিয়ে দিতে। অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। রাত্রিকালে সূর্য্যের আলোক পাতের মতোই অসম্ভব!

তুষারপাত

দিনের আলো ফুরিয়ে এলো। অন্ধকার এসে তার আধিপত্য বিস্তার করে। এবং সেই অন্ধকার কক্ষে একমাত্র মিলানিওর চোখ দু'টি জ্বল-জ্বল ক'রে ওঠে।

ভৃত্য ঘরের মধ্যে আলো জেলে দিয়ে নিজের কাজে চলে যেতে সিনর অডোয়ারডো পুনরায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর মুদ্রিত চক্ষুর ভেতর দিয়েও নিরীক্ষণ ক'রতে লাগলেন—তাঁর মেয়ের দোল্না। মেয়ের সেই কচি মুখের হাসি, তার ক্রন্দন; মনের মধ্যে তাঁর এক অভূত-পূর্ব্ব অবস্থার সৃষ্টি ক'রলো। অন্তিম-শয্যায় শায়িত তাঁর স্ত্রীর সেই শেষ-চুম্বন রেখাটুকু এখনো তাঁর মুখে আছে সজীব হয়ে। অন্তিম-শয্যায় শায়িত স্ত্রীর সেই শেষ অস্ফুট-বাণী—আমার ডরেটাকে কখনো অযত্ন করোনা—তাঁকে মর্ম্মান্তিক যাতনা দেয়। এই সামান্য ক'টি কথা। কিন্তু তাঁর মনকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে যেনো তাঁর অন্তরের গভীরতম স্থানে কশাঘাত ক'রে ব'সলো, এবং সেই আঘাতে সিনর অডোয়ারডো ভ্রষ্টপথে যেতে-যেতে নিজেকে সংযত ক'রে নিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপ্-টপ্ ক'রে তপ্ত অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। না না—ডরেটা, তাঁর প্রাণের ডরেটাকে অসুখী ক'রতে তিনি পারবেন না। পারবেন না কখনো।

কিন্তু তিনি নিজেকে বিশ্বাস ক'রতে পারেন না। সিনোরা ইভ্লিনার সম্মোহনশক্তি, যা নাকি, তাঁর চক্ষু-দৃষ্টির সঙ্গে এক হয়ে মিশে, গিয়েছে সেই শক্তিকে তিনি ভয় করেন, যথার্থই ভয় করেন। তাঁর প্রাণ ভয়ে সশঙ্কিত হয়ে ওঠে, পাছে আবার আগামী-কাল প্রভাতে এই মায়াবিনীর দৃষ্টির সুমুখে পড়ে যান।

কিন্তু উপায় আছে—একমাত্র উপায় আছে।

অডোয়ারডো আর্দ্রস্বরে ডরেটাকে আহ্বান ক'রলেন।

—কি বাপী ?

—তোমার দিদিমাকে যে চিঠিটা লিখছিলে, সেটা কি এখন নকল ক'রবে মা ?

—হ্যাঁ বাপী, ক'রবো।

—দিদিমাকে দেখতে যাবে না ?

—কার সঙ্গে যাবো বাপী ?

—আমার সঙ্গে, ডরেটা।

ডরেটা যেনো নিজের কানকে বিশ্বাস ক'রতে পারে না।

ব'ল্লো, তোমার সঙ্গে ? বাপী, তোমার সঙ্গে ?

—হ্যাঁ আমার সঙ্গে, তোমার এই বাপীর সঙ্গে মা !

শুনে ডরেটার সারা অন্তরটায় আনন্দের স্রোতস্বিনী বইতে থাকে। পিতার কণ্ঠদেশ তার ক্ষুদ্র দু'টি বাহু দিয়ে বেষ্টন ক'রে আদর ক'রতে ক'রতে বলে, বাপ্পা বাপী, আমার বাপী ! আমরা বেরুবো কখন ?

—কাল সকালে। অবশ্য যদি তুমি তুষারপাতের ভয় না করো।

—আজকে চলোনা বাপী—এখুনি ? হ্যাঁ বাপী, এখুনি। সে কিন্তু বেশ মজার হবে বাপী ! চলো বাপী, আজই চলো !

সিনর অডোয়ারডো ধীরে ধীরে কন্যার বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলেন। তারপর মন্ত্রচালিতের মতো উঠে সেই বাতায়নটার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলেন। ওঁর জানালার ঠিক সম্মুখের বাড়ীটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সিনোরা ইভ্লিনার মুখের পার্শ্ব-

ভাগ ওঁরই জানালাসংলগ্ন শার্সিটার গায়ে আর প্রতিফলিত হচ্ছে না। আবহাওয়া এখনও ভীতিপ্রদ। তুষার পড়ছে। ভৃত্য এসে জানালার খড়খড়িগুলি বন্ধ ক'রে একটা পর্দ্দা দিলে টেনে। কি জানি আবার যদি ঐ সম্মুখের বাড়ীটা থেকে মায়ামুগ্ধ-দৃষ্টি এসে এ-বাড়ীতে পৌঁছিয়ে এঁদের গৃহের পবিত্রতা মুছে দেয় !

—অডোয়ারডো হঠাৎ ব'ল্লেন, এখানেই খাওয়া ভালো। কারণ, আমাদের খাবার ঘরখানা নিশ্চয়ই গ্রীণল্যাণ্ডের মতো নিদারুণ ঠাণ্ডায় ভর্ত্তি হয়ে আছে।

পিতার কথা শুনে ডরেটা রান্নাঘরে গিয়ে ঔৎফুল্লের একটা তুমুল সারগোল তুলে পাচিকাকে অস্থির ক'রে তুল্লো :—তাদের পরি-ভ্রমণ এখুনিই সুরু হবে। অতএব শীঘ্র যেনো তার ও তার বাবার খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়। পাচিকা প্রথম দিকটা মনে ক'রে নেয়, ওটা বুঝি একটা তামাসা। কিন্তু যখন ডরেটা জানায়, সে তার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা ক'রছে না—সত্যিই তারা এখান থেকে চলে যাবে, তখন পাচিকা মনে-মনে ধারণা ক'রে নেয়—এই বাড়ীর কর্ত্তার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। এই শীতকালে, অস্বাভাবিক বিশ্রী আবহাওয়াকে মাথায় ক'রে ভ্রমণে বের হওয়া ? আশ্চর্য্য ! সত্যি আশ্চর্য্যের ব্যাপার।

কিন্তু তার মন্তব্যে ডরেটার কী এমন যায়-আসে ? সে তাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্রও ক'রলো না। অধিকন্তু আনন্দাতিশয্যে গান গেয়ে, নেচে সমস্ত ঘরখানাই মুখরিত ক'রে তুল্লো।

খেতে ব'সে দেখা গেলো, ডরেটা আহার ক'রছে অল্প। কিন্তু

কথা ব'লছে অনর্গল। বারংবার সে তার পিতাকে প্রশ্ন করে, এখন সময় কতো? কখন, কটার সময়, আমরা বেরুবো বাপী?

ডরেটার পিতা সহাস্যে ব'ল্লেন, তুমি কী ট্রেণ্ ফেল করবার ভয় ক'রছো, ডরেটা?

তিনি কন্যাকে এ-প্রশ্ন ক'রলেন বটে, কিন্তু তাঁর নিজের মনই এখান থেকে রওনা হবার জন্যে, চাইকি ডরেটার চেয়েও, অধিকতর অস্থির হয়ে উঠলো। তিনি চলে যেতে চান দূরে—বহুদূরে। সম্ভবতঃ বসন্তের পূর্ব্বে তিনি ফিরবেন না। ভৃত্যকে ডেকে তাঁদের জিনিষ-পত্তর বাঁধাছাদা ক'রতে আদেশ দিলেন।

নিয়মিত শয্যা গ্রহণ করবার অনেক পূর্ব্বেই আজ ডরেটাকে বিছানায় দেখা যায়। কিন্তু সারা রাত্রিটাই ও বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ ক'রে কাটিয়ে দিলে। রাত্রে প্রায় বিশবার সে তার আয়াকে জাগিয়ে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলো, এখন কি—ওঠবার সময় হয়েছে?

পরদিন ভোর ছ'টার সময় ভৃত্য এসে সিনর অডোয়ারডোকে বিছানা থেকে তুলে দেয়। তিনি ওকে প্রশ্ন করেন, আজকের দিনটা কেমন দেখ্ছিসরে, এ্যাংগিলো?

—অতি বিশ্রী। ঠিক্ কালকের মতো। আমি ব'লি কি, আজকে যাত্রা না ক'রলেই যেনো ভালো হয়।

সিনর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন:—

তুষারপাত

না, এ্যাংগিলো। আজই আমার যাওয়া দরকার।

ইষ্টিশানে লোক জনের ভিড় ছিলো না। শুধু গুটিকতক পথচারী গরম জামা কাপড়ে সর্ব্বদেহ আচ্ছাদিত ক'রে এক জায়গায় উপবিষ্ট। তাদের সকলের মুখেই একটা বিরক্তির এবং নিরানন্দের ভাব প্রস্ফুটিত। ওরা বলাবলি করে—এমনি বিশ্রী দিনে বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া, কে বাবা বাড়ীর বাইরে পা বাড়ায়? আমাদের কাজ বড়ো জরুরী, তাই না এমনি বিশ্রী দিনে, এমনি সময়ে, শয্যা ছেড়ে এখানে আসতে হয়েছে!

কিন্তু ডরেটার মনে বিরক্তির বা নিরানন্দের কোনো ছায়াই নেই। বরঞ্চ ওকে অন্যদিনের চেয়ে আজ, এমনি বিশ্রী দিনে, ঢের বেশী খুশী ব'লেই মনে হয়।

প্রথম শ্রেণীর কামরায় আসন গ্রহণ ক'রে সিনর অডোয়ারডো কন্যাকে ব'ল্লেন, ডরেটা খুশী হয়েছো?

—হ্যাঁ, এমন খুশী কখনো হইনি বাপী। আমার যা' আনন্দ হচ্ছে!

দশবছর পূর্ব্বে, শীতঋতুর এক চমৎকার দিনে, সিনর অডোয়ারডো বিয়ে ক'রে ফিরছিলেন। ট্রেণের কামরায় তাঁর সুমুখের আসনে মেয়েটি উপবিষ্ট ছিলো। তার মুখখানি ডরেটারই অনুরূপ। কোথাও

এতটুকু পার্থক্য ছিলো না। সে ওঁর মুখপানে শিশু-সুলভ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলো। কী ভালোই বাসতো সে সিনর অডোয়ারডোকে! ট্রেণ অগ্রসর হতে সুরু ক'রলে তিনি ঐ একই প্রশ্ন তাকে ক'রেছিলেন :—

খুশী হ'য়েছো, মেরিয়া?

এবং সেও উত্তর দিয়েছিলো ঠিক্ ডরেটার মতো :—

হ্যাঁ, এমন খুশী কখনো হইনি! আমার যা' আনন্দ হচ্ছে!

ট্রেণ বাতাসের বেগে ছুটে চলে। বিদায়—চিরদিনের মতো বিদায়! সিনোরা ইভ্লিনা, বিদায়!

মাস কতোক পরে সিনর অডোয়ারডো ফিরে এসে দেখলেন, তাঁর টেবিলটার ওপর ইভ্লিনার পুনর্বিবাহের একখান নিমন্ত্রণ পত্র পড়ে রয়েছে।

বুকিওলো এবং তাঁর অধ্যাপক

বুকিওলো আর পিট্রোপোলো। এঁরা ছ'টি বন্ধু। অন্তরঙ্গতায় বোধকরি ওঁরা রোম নগরীর সাভেলী পরিবারের পূর্ব্বপুরুষদের অতিক্রম ক'রে গিয়েছেন। তাঁরা উভয়েই সাভেলী পরিবারের অন্তর্ভূত। উভয়ের আর্থিক-অবস্থা স্বচ্ছল। বংশগরিমা এমনি যে, ভিন্ন-সম্প্রদায়ের লোক ওঁদের যথেষ্ট সম্মান না দিয়ে পারত না।

উচ্চশিক্ষার শেষে নিজেদের স্বাবলম্বী করবার অভিপ্রায়ে, এই ছ'টি অভিন্নহৃদয় বন্ধু বোলনা শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়েছিলেন। বুকিওলো এবং পিট্রোপোলোর মধ্যে অনন্যসাধারণ হৃদ্যতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, পরস্পরের পাঠ্য বিষয়-বস্তু এক ছিলো না। বুকিওলোর বিষয়-বস্তু সহজ থাকাতে, তিনি অনেক পূর্ব্বেই ডিগ্রি লাভ ক'রে রোম নগরীতে ফিরে যাবার বাসনা প্রকাশ ক'রলেন। কাজেই একদিন বন্ধুকে ব'ল্লেন, ভাই পিট্রো, আমার শিক্ষা শেষ হলো; ডিগ্রিও পেলুম। এখন শুধু বাড়ী, মানে স্বদেশে ফিরে যেতেই যা' বাকী! আমি ব'লি কি—তোমার তো এখনো যেতে দেরী আছে। তুমি যদি মত দাও—তো আমি কালই বাড়ী ফিরে যাবার বন্দোবস্ত ক'রে ফেলি—কি বলো.?

পিট্রোপোলো অসম্মতি জানিয়ে ব'ল্লেন, না—তা' কিছুতেই হ'তে পারে না। আমাকে এখানে ফেলে রেখে তুমি বাড়ী যাবে? না—এতে আমার মত নেই।

এই পর্য্যন্ত ব'লে ক্ষণকাল মৌন থেকে পুনশ্চ ব'ল্লেন তোমার প্রতি আমার অনুরোধ—এই শীতকালটা আর আমাকে ফেলে যেওনা। বসন্ত আসুক। দু'জনেই একসঙ্গে ফিরে যাবো। এক যাত্রার আবার পৃথক ফল কেন?

বুকিওলো বন্ধুর বলার রকম দেখে হেসে ফেল্লেন। ব'ল্লেন, কিন্তু এ'কমাস সময় নষ্ট ক'রবো? তুমি তো জানো পিট্রো, আলস্যে জীবন কাটানো আমার স্বভাবের বাইরে?

পিট্রো পাইপে অগ্নি-সংযোগ ক'রে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ব'ল্লেন বৃথাই বা সময় নষ্ট ক'রবে কেন? যা'-হোক আর একটা কিছু শেখো। এমন জিনিষ শেখো, যা' তোমার সম্পূর্ণ অজানা।

বুকিওলো বহুক্ষণ চুরুট টান্তে টান্তে নীরবে ব'সে চিন্তা ক'রতে লাগলেন। বন্ধুকে প্রতিশ্রুতি দিলেন—তাঁর জন্যে তিনি বসন্ত কাল পর্য্যন্তই অপেক্ষা ক'রবেন।

পরদিন প্রভাতবেলায় বুকিওলো তাঁর প্রফেসারের কাছে এলেন। পিট্রোপোলোর অনুরোধে বসন্ত কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এখানে থাকবার সঠিক সংবাদ জানিয়ে পরিশিষ্টে ব'ল্লেন, স্যার এই সময় টুকু আপনার কাছ থেকে একটা নতুন কিছু শিখতে চাই। আপনি কি বলেন?

বুকিওলো এবং তাঁর অধ্যাপক

প্রফেসর স্মিতহাস্যে ব'ল্লেন বেশ তো! সে তো পরম আনন্দের কথা। তোমরা ছাত্র—আমি শিক্ষক। তোমাদের যা' কিছু শেখবার ইচ্ছে হবে—সবই আমি আনন্দের সঙ্গে শেখাবো। শিক্ষা দেওয়ার মতো আনন্দের জিনিষ আর কিছু নেই, বাবা আর কিছু নেই।

প্রফেসরের এই উক্তিতে বুকিওলো পরমানন্দে ব'ল্লেন, স্যার তা'হলে আমায় এই শিক্ষা দিন, যাতে ক'রে একজন যুবক সরলভাবে নারীর সঙ্গে ভালোবাসায় পড়তে পারে। ব'ল্লেন, আমি এ-বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। আপনাকে প্রথম থেকে ধীরে ধীরে শেখাতে হবে স্যার। এ পৃথিবীতে অনেক বিজ্ঞান আপনার অধ্যাপনায় শিখলাম। কিন্তু এই পূর্ব্বরাগ যে কি জিনিষ এবং কেমন ক'রেই বা করে, জানিনে। ইচ্ছে, আপনার কাছ থেকে এ-বিষয়ে পুরোপূরি জ্ঞান লাভ করা।

প্রফেসর ছাত্রের কথা শুনে সীমাহীন উল্লাসে যেনো ফেটে পড়লেন। দাড়িতে হাত বুলিয়ে পরিতৃপ্তির স্বচ্ছ-হাস্যে ব'ল্লেন, বেশ বেশ! এ—বিদ্যায়ও আমার অনন্ত জ্ঞান। ব'ল্লেন, সময় নষ্ট করা কখনো যুক্তিসঙ্গত নয়। কাল সকালেই ফ্রেটি মাইনোরির গির্জ্জায় যাবো। কাল কি বার—? রবিবার, না? তা ঠিক্ই হয়েছে। রবিবার দিন-ই তো গির্জ্জায় উপাসনা করবার জন্যে প্রচুর নারীসমাগম হয়ে থাকে। তাই না?

—আপনিই জানেন স্যার।

প্রফেসর গম্ভীর হ'য়ে ব'ল্লেন, হ্যাঁ, আমিই জানি। ঠিক জানি। নিশ্চয় জানি। কাল গির্জ্জায় গিয়ে উপাসনা কালে ঐ সব সমবেত নারীদের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। দৃষ্টি রাখবে এমনি ভাবে

যাতে তাদের মধ্যে একজন তোমার পছন্দের মধ্যে, ঠিক্ মক্ষিকা যেমন মধুতে আটকে যায়, ঠিক তেমনি ভাবেই যাবে আট্‌কে।

ব'ল্লেন হুঁ, তারপর সে যখন তার উপাসনা শেষ ক'রে বাড়ী মুখো হবে, তুমি তাকে ক'রবে অনুসরণ। অনুসরণ ক'রবে মেয়েটীর অজ্ঞাতে এবং অলক্ষ্যে। উদ্দেশ্য, তার থাকবার স্থানটুকু জানা। এই হলো তোমার নতুন পাঠের সর্ব্বপ্রথম আয়ত্ত করবার জিনিষ। ক্রমশঃ অগ্রসর হবে তুমি। কিন্তু দৈনন্দিনের বুঝিয়ে দেওয়া পাঠ, আমার কাছে এসে তোমায় দিতে হবে বুঝিয়ে। কি ঘটলো, কি ঘটলো না—সমস্তই আমার কাছে এসে সারল্যে প্রকাশ ক'রবে। নইলে, আমি বুঝতে পারবো না, কতোদূর তোমার এই নতুন পাঠ এগিয়ে চলেছে—বুঝ্‌লে?

বুকিওলো ঘাড় নেড়ে জানালেন—বুঝেছেন।

পরদিন রবিবার। বুকিওলো সকালের দিকটায় তাঁর প্রফেসরের নির্দ্দেশমত গির্জ্জায় গিয়ে উপস্থিত। সেখানে দেখলেন—সুন্দরীর হাট। একে দেখেন, ওকে দেখেন, তাকে দেখেন—মনে আর কাকেও ধরতে চায় না। কিন্তু শেষকালে চোখজোড়া একটি সুন্দরীর দিক থেকে আর যেনো ফিরিতে চায় না! সত্যিই সে সুন্দরী। মনে হয়, ভগবান এই নারীটিকে জগতের যতো কিছু সৌন্দয্য একত্র ক'রে সৃষ্টি ক'রেছেন। কী অপূর্ব্ব মুখশ্রী। শ্বেতপাথর কুঁদে ভাস্কর যেমন সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, এও ঠিক তেমনি।

বুকিওলো এবং তাঁর অধ্যাপক

উপাসনার শেষে মেয়েটি গৃহেরদিকে অগ্রসর হয়। বুকিওলো তার অন্তরাল থেকে অনুসরণ ক'রলেন। মিনিট পাঁচ-সাত পরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সেই মূর্ত্তিমতি সুন্দুরী বাঁদিক্ ঘেঁষে দু'-চার পা' সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হ'বার পর একটা লাল রংয়ের বাড়ীর দরজা ঠেলে ভেতরে মিশিয়ে গেলো।

এই ঘটনার ঘণ্টা খানেক পরে বুকিওলো তাঁর প্রফেসরের কাছে এসে ব'ল্লেন, স্যার, আপনি যা, আমাকে ক'রতে উপদেশ দিয়েছিলেন, সবই আমি নিখুঁতভাবে পালন করেছি। এখন মনে হচ্ছে, যেনো আমার তাকে বেশ মনে লেগেছে।

প্রফেসর মুখের পাইপ নামিয়ে গম্ভীরভাবে ব'ল্লেন, বেশ। এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে ব'ল্লেন, এর পর যা' তোমায় ক'রতে হবে মন দিয়ে শোনো। ব'ল্লেন, দিন কতোক দু'-তিনবার সেই মেয়েটির বাড়ীর সুমুখে নিজের আভিজাত্য বজায় রেখে ঘোরাধুরি করো। তোমার চোখ জোড়া নিজের দেহের দিকে নিবদ্ধ রেখে এমন ভাবে মাঝে-মাঝে মেয়েটির মুখপানে চাইবে, যাতে অন্য কেউ বুঝতে না পারে। ওর মুখে যেদৃষ্টি তোমার চোখ থেকে ঠিক্‌রে গিয়ে পড়বে—সে দৃষ্টিতে যেনো থাকে পূর্ণ মাদকতা, যেনো থাকে গোলাপ ফুলের সৌরভ। সেই মাদকতা ও সৌরভ একযোগে মিশে সেই মেয়েটিকে, সেই সুন্দুরী মেয়েটিকে সাংল্যে জানিয়ে দেবে—তোমার বুকের ভাষা।

এই পর্য্যন্ত ব'লে প্রফেসর পুনশ্চ মুখে পাইপ দিলেন। দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

বুকভরা আশা, মনভরা কৌতূহল এবং প্রাণভরা উৎসাহ নিয়ে বুকিওলো দিন দুই-তিন সেই মেয়েটির বাড়ীর সুমুখে এদিক্-ওদিক্ পায়চারি ক'রলেন। মেয়েটির দৃষ্টি একদিন তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে বিনিময় হতেই তিনি সসম্মানে মাথা নীচু ক'রে তফাতে চলে এলেন। তফাতে এসে মেয়েটির অলক্ষ্যে দেখলেন, সে চোখ ফিরিয়ে তাঁকেই দেখবার চেষ্টা ক'রছে। বুকিওলো যেনো একমুহূর্ত্তে ইন্দ্রপুরীতে চলে গেলেন! এমনি তাঁর আনন্দ হলো। অধ্যাপককে মনে-মনে প্রণিপাত ক'রে তিনি পুনশ্চ আড়াল থেকে মেয়েটির দৃষ্টির মধ্যে এলেন। এবং নিতান্ত অনিচ্ছা ও অতর্কিতের ভাব দেখিয়ে আর একবার তার মুখপানে দৃষ্টিপাত ক'রলেন। চারিচক্ষে আবার মিলন। মেয়েটি দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ ক'রতে গিয়ে বারংবার তাঁর দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো।

মেয়েটিও যে তাঁকে চায়, এ-সম্বন্ধে বুকিওলোর সন্দেহমাত্র রইলো না।

যথাসময়ে বুকিওলো প্রফেসরের কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে বর্ণনা ক'রলেন। প্রফেসর নিজের অভিজ্ঞতার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে ধীরে ধীরে ব'ল্লেন, তোমার বুদ্ধি দেখে আমি সত্যি অত্যন্ত খুশী হ'য়েছি। তুমি বুদ্ধিমান ছোক্‌রা। বুঝলে হে, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছোক্‌রা।

প্রফেসর পকেট থেকে একখানি রুমাল টেনে নিয়ে পরিশ্রমক্লান্ত মুখখানি ভালো ক'রে মুছলেন। মুছে রুমালটা যথাস্থানে রেখে একবার

বুকিওলো এবং তাঁর অধ্যাপক

দুই কাঁধ ঈষৎ ঝাঁকুনি দিয়ে ব'লে উঠলেন, এখন দরকার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—তোমার ঐ মেয়েটির সঙ্গে বাক্যালাপ করার। তা' দেখা সম্ভব হবে, একটা নীচ জাতির স্ত্রীলোকের সাহায্যে। পথে-ঘাটে এই জাতীয় স্ত্রীলোক আর্শী, ভ্যানেটি ব্যাগ, নারীদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি-করবার যাবতীয় জিনিষ বহে বেড়ায়, বাড়ী-বাড়ী বিক্রি করার জন্যে। এদের একজনকে ঠিক করো। ওকে দিয়ে জানাও, তুমি মেয়েটির একান্তই অনুরক্ত। জগতের সমস্ত নারী একধারে, আর সে একা একদিকে। তাকে সন্তুষ্ট ক'রতে তুমি এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই নিঃসঙ্কোচে ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত।

প্রফেসর কিছুক্ষণের জন্যে মৌন হ'য়ে রইলেন। একসময়ে ব'ল্লেন, দু'-দিন লাগুক, বা তিন দিন লাগুক—তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি যেমন শিক্ষা দিলাম, ঠিক সেই মতো কাজ ক'রে ফলাফল আমাকে শীঘ্র জানিও। তারপর পথ ব'লে দোবো—আরো অগ্রসর হয়ে যেতে। আমি কি ব'লতে চাই, বুঝতে পেরেছো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। এতো সোজা কথা।

বুকিওলো প্রফেসরকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ভাবটা এই—মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হ'লে ওঁর অনেক কিছু লোকসান হয়ে যাবে।

কিন্তু দু'দিন পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর এই ব্যবসায়ে লিপ্ত, একটা ছোটো জাতের বৃদ্ধা স্ত্রীলোক পাওয়া যায়। মনে হয়, ও নিজের

ব্যবসায়ে বিলক্ষণ নিপুণ। বুকিওলো ভাবেন, একে দিয়েই কাজ হবে।

স্ত্রীলোকটিকে গোপনে ডেকে বুকিওলো ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে যা' ব'ল্লেন তার সারমর্ম্ম হলো এই যে—সে যদি তাঁর একটা কাজ উদ্ধার ক'রে দিতে পারে, তাকে যথেষ্ট পুবস্কার তিনি দেবেন।

স্ত্রীলোকটি মনে-মনে সন্তুষ্ট হয়েই ব'ল্লো, আপনি তো জানেন, যে রকম ক'রেই হোক্‌ টাকা রোজগার করাই আমার ব্যবসা। আপনি যা' ব'ল্‌লেন, যেমনটি ক'রতে হুকুম ক'রবেন—ঠিক তেমনটিই ক'রবো—একটুও নড়্‌চড়্‌ হবে না।

—কিন্তু আমি যেটুকু বলবো, ঠিক্‌ সেইটুকু ক'রলে তো চ'লবে না বাপু! তোমার নিজের বুদ্ধিও খাটাতে হবে যে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজের বুদ্ধিও খাটাবো বৈকি! নিজের বুদ্ধি না কাজে লাগালে কি, পয়সা আসে মশাই?

বুকিওলো এর জবাবে কিছু না ব'লে পকেট থেকে দু' ফ্লোরিন্স তার হাতে গুঁজে দিলেন। দিয়ে তাকে বেশ ভালো ক'রে তাঁর প্রেমিকার বাড়ীর পথ, নম্বর, বাড়া কী রকম দেখতে ইত্যাদি বুঝিয়ে দিয়ে ব'ল্লেন, ঐ মেয়েটিকে আমি অত্যন্ত সম্মান ক'রি। তুমি বুদ্ধি খাটিয়ে আমার হ'য়ে এমন সব মন ভুলোনো কথা তাকে ব'লবে, যাতে সে আমার ওপর প্রসন্ন হয়, যাতে আমি তার একটুখানি ভালোবাসা পেতে পারি।

স্ত্রীলোকটি সুচতুরা। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে ফিক্‌ ক'রে হাসলো।:—আপনি নির্ভাবনায় থাকুন। আমাকে বিশ্বাস

ক'রে কাজের ভার দিয়েছেন। আপনার কাজ উদ্ধার না ক'রে আমি ছাড়বো না।

এই ব'লে সে তার মাল বোঝাই ঝুড়িটা মাথায় তুলে যাবার উপক্রম ক'রলো।

বুকিওলো বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, দেখো বেশী দেরী ক'রোনা কিন্তু। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রবো।

—আজ্ঞে, আচ্ছা।

বাড়ীটা চিনে নিতে স্ত্রীলোকটির একটুও দেরী হ'লো না। বাড়ীটার কাছে, একেবারে কাছে এসে দেখলো, বুকিওলোর প্রেমিকা ফটোকের সুমুখেই দাঁড়িয়ে বোধকরি পার্কের উন্মুক্ত বাতাস গ্রহণ ক'রছে। কানের কাছে মুখ রেখে ফিস্-ফিস্ ক'রে ব'ল্লো; আপনার পছন্দ ক'রবার মতো অনেক জিনিষ আছে।

এই ব'লে সে মুহূর্ত্তের মধ্যে তার ঝুড়িটা নামিয়ে ভালো ভালো দ্রব্যগুলি একে একে মেয়েটির দৃষ্টির ওপর তুলে ধরলো :—কিছু নিন্। যা' আপনার পছন্দ হয়, তাই নিন্। অন্ততঃ একটা। একটা আপনাকে নিতেই হবে! নিতেই হবে কিন্তু। আপনার জন্যেই তো এতো কষ্ট ক'রে আসা।

মেয়েটির নাম গিওভানা।

গিওভানার পছন্দ, একটা ভ্যানেটি ব্যাগ।

ব'ল্লো, তোমার সব জিনিষের মধ্যে ঐ ব্যাগটাই আমার চোখে

লেগেছে। কিন্তু দাম নিশ্চয় বেশী। বেশী দাম হ'লে বাপু কিনতে পারবো না. তা' কিন্তু ব'লে রাখছি ।

—দাম? দামের কথা আপনি কী ব'লছেন? সব জিনিষ গুলো আপনি নিয়ে ঘরে তুলে রাখুন না। দাম আপনার এক কড়িও দিতে হবে না। কেন হবে না জানেন?

এই ব'লেই সে একটু মুচকি হেসে গিওভানাকে ফিস্-ফিস্ ক'রে কি ব'ল্লে, বোঝা গেলো না। কিন্তু গিওভানা সে কথায় নিরতিশয় বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো : এ'কথা বলার মানে?

—মানে? আজ্ঞে মানে যদি শুনতে চান, তো মানে করবার আমার একটু মাত্রও আপত্তি নেই।

—হ্যাঁ—আমি শুনতে চাই! সব কথারই মানে থাকে!

—থাকে বৈকি। নিশ্চয়ই মানে থাকে।

এই পর্য্যন্ত ব'লে স্ত্রীলোকটি কিছু কালের জন্যে ঝুড়ির ভেতরকার বস্তুগুলির ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে পরক্ষণেই গিওভানার সুন্দর মুখ প্রতি চাইলো। ব'ল্লে, আপনি যখন নেহাৎ শুনবেন, তখন আর না ব'লে উপায় কি? মরি মরি! কী রূপ রে আমার বাছার! সাধে কি বুকিওলো ছোকরাটি আপনার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন! আহা ছেলেটি আপনাকে কী ভালোই না বাসেন। ছায়া যেমন কায়াকে ভালোবাসে, দেহ যেমন প্রাণকে ভালোবাসে—তেমনি ভালোবাসেন উনি আপনাকে। এক কথায় সমস্ত জগৎ একদিকে, আর আপনি একদিকে। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য, বুকিওলোর আপনার প্রতি

ভালোবাসায় কোথায় না-জানি যায় ভেসে। জগতে কেউ এমন গভীরভাবে ভালোবাসতে শেখে নি। কিন্তু কী দুঃখেই-না বেচারা বুকিওলোর মনটা ভরে ওঠে! আপনার সঙ্গে কথা না ব'লতে পাওয়ার জন্যে, হয়তো শেষে ওঁর মৃত্যু হ'তে পারে।

স্ত্রীলোকটির কথায় গিওভানার মুখখানি দেখতে দেখতে লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠলো। সমস্ত মনটা ঘৃণায় এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হ'য়ে যায়। ক্রোধপূর্ণ-স্বরে তাকে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লো, দূর হ' মাগি—শীগ্গির এখান থেকে দূর হ'। নইলে, এমন শিক্ষা দোবো যে, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্তও মনে থাকবে।

গিওভানা দরজার পাশ থেকে একটা লৌহদণ্ড নিলো তুলে। বল্লো, হতভাগা বজ্জাৎ মাগি কোথাকার! আমার সঙ্গে এসেছিস চালাকি ক'রতে? বেরো—বেরো। এখুনি দূর হ' আমার সামনে থেকে।

সেই মহিলাটি গিওভানার অগ্নিমূর্ত্তিতে সত্যি ভয়ে কাঁপতে লাগলো। চক্ষের নিমিষে সে তার দ্রব্যগুলি ঝুড়ির মধ্যে ভরে একরকম দৌড়েয়েই বুকিওলোর কাছে এসে হাঁপাতে লাগলো।

বুকিওলো উদ্বিগ্ন-চিত্তে ওর জন্যেই প্রতীক্ষা ক'রছিলেন। ব'ল্লেন, কী হ'লো? কাজ এগোলো কতো দূর?

স্ত্রীলোকটি তাঁর হাতে, তাঁরই দেওয়া টাকা ফিরিয়ে দিলে। ব'ল্লো, এই নিন আপনার টাকা ফেরৎ। বাপ্‌রে বাপ্‌! আর একটু হ'লেই আমার মাথাটা লোহার ঘায়ে দিয়ে ছিলো উড়িয়ে আর কি!

উঃ—ভগবান রক্ষা ক'রেছেন। আপনি অন্য লোক দেখুন গে'। আমার দ্বারা হবে না। শেষে কি প্রাণটা খুইয়ে ব'সবো ?

বুকিওলো বিলম্ব না ক'রে অধ্যাপকের কাছে আবার এলেন। এসে, আজকের ঘটনার কথা সমস্তই খুলে ব'ল্লেন।

শুনে প্রফেসর লেশমাত্রও হতাশ হ'লেন না। ছাত্রকে উৎসাহ দিয়ে ব'ল্লেন, বুকিওলো হতাশ হ'ও না। তুমি তো জানো, এক আঘাতে একটা বড়ো গাছকে ভূমিস্মাৎ করা সম্ভব নয়। অন্যদিনের মতো আজো মেয়েটির বাড়ীর সুমুখে পায়চারি ক'রো গিয়ে। লক্ষ্য রেখো তার দৃষ্টির দিকে, এবং বোঝবার চেষ্টা ক'রো, সত্যিই সে তোমার ওপর রেগে গিয়েছে কিনা।

এই নতুন পাঠে বুকিওলোর মনটা একটু একটু ক'রে রঙিণ হয়ে উঠছিলো। তিনি পূর্বদিনের মতো গিওভানার বাড়ীর সামনে পায়চারি ক'রতে লাগলেন।

গিওভানা বুকিওলোকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে নীচে নেমে। দাসীকে ডেকে বলে ঐ, ঐ যে সুন্দর ছেলেটি চলে যাচ্ছেন, ওঁকে গিয়ে বল্—আজ সন্ধ্যার পর আমার এখানে আসতে। হ্যাঁ আজ—কোনো ভুল যেনো না হয়। যা—যা! দেরী ক'রিসনে—চ'লে গেলো বুঝি। দোড়ে যা—শীগ্গির, শীগ্গির।

বুকিওলো এবং তাঁর অধ্যাপক

দাসী যথাসময়েই বুকিওলোর কাছে আসে। সবিনয়ে বলে, আমার মনিব গিওভানা, হ্যাঁ আমার মনিব গিওভানা, আজ সন্ধ্যায় আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করেন। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রতে তাঁর অত্যন্ত ইচ্ছে।

বুকিওলো তাঁর এই সৌভাগ্যে খুশী হন—অসম্ভব খুশী হন। বলেন, —ব'লো, আমি, আমি যাবো—নিশ্চয়ই যাবো!

বুকিওলো সাফল্যের উত্তেজনায় তৎক্ষণাৎ প্রফেসরের কাছে ফিরে এলেন। এসে সবই খুলে প্রকাশ ক'রলেন।

কিন্তু প্রফেসরের মনের মধ্যে একটা সন্দেহ মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। মেয়েটির নাম, বাড়ীর নম্বর শুনে মনে আশঙ্কা হয়—এ তাঁর নিজের স্ত্রী নয় তো? নানান চিন্তা তাঁর মনে ভিড় ক'রে তাঁকে উত্তেজিত ক'রে তোলে। হঠাৎ এক সময়ে ছাত্রকে প্রশ্ন করেন, তুমি কি ঠিক্ ক'রলে? যাবে তুমি?

—নিশ্চয় যাবো, স্যার।

—যাবে?

—যাবো না—আপনি কী ব'লছেন, স্যার?

—তা হ'লে আমাকে কথা দিয়ে যাও যে, যাবার আগে তুমি আমার এখান থেকে একবার হ'য়ে যাবে।

—আজ্ঞে স্যার। তাই ক'রবো। যাবার আগেই আমি আপনার এখানে আসবো। জানিয়ে যাবো—আমি এবার যাচ্ছি।

এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখা ভালো যে, প্রফেসর রাত্রিবেলা বাড়ী ফিরতেন না। শীতকালে পড়াশুনো এবং লেকচারের মধ্যেই কলেজে রাত্রি কাটাতেন।

*　*　*　*　*　*　*

যথাসময়ে বুকিওলো এলেন। ব'ল্লেন স্যার, আমি যাচ্ছি। আপনার কিছু ব'লবার আছে ?

প্রফেসর অন্যমনস্কে কী যেনো ভাবছিলেন। ছাত্রের প্রশ্নে হঠাৎ যেনো তাঁর খেয়াল হলো। ব'ল্লেন, কী ব'লছো—আমার কিছু ব'লবার আছে কি না ?

—আজ্ঞে স্যার।

—বলবার ? হ্যাঁ তা' বলবার আছে বৈকি ! দেখো, বুকিওলো, তুমি যে বিপদের মধ্যে যাচ্ছো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সব সময়ে সতর্ক থেকো। নিজের প্রাণটি যেনো হারিয়ে ব'সো না।

—আপনি কিছু ভাববেন না, স্যার। আমি ঠিক বেঁচেই আবার আপনার কাছে ফিরে আসবো ! আপনার আশীর্ব্বাদ যে আমার মাথার ওপর রয়েছে, স্যার। বিপদে প'ড়বো কেন ?

বুকিওলো ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু প্রফেসর আজ আর নিশ্চিন্তে ব'সে থাকতে পারলেন না। তিনি ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে ঘরের বাইরে এলেন। এবং দূর থেকে বুকিওলোকে অনুসরণ ক'রে পথ চ'লতে সুরু ক'রলেন।

বুকিওলো এবং তাঁর অধ্যাপক

যথাসময়েই প্রফেসর দেখলেন তাঁরই লালরংয়ের দোতোলা বাড়ী-টার দরজায় এসে বুকিওলো মৃদু আঘাত ক'রতেই তাঁর স্ত্রী, অনন্যসাধারণ সুন্দরী স্ত্রী গিওভানা, এসে দরজা খুলে তাঁকে ভেতরে এনে দরজা দিলে বন্ধ ক'রে।

আপনারা একবার প্রফেসরের মনের অবস্থা অনুভব ক'রতে চেষ্টা করুন। প্রিয় ছাত্রকে লাভমেকিং শেখাতে গিয়ে তিনি অজ্ঞাতসারে নিজের বাড়াতেই, খাল কেটে কুমীর এনেছেন। ছাত্রকে নিয়ে খেলা ক'রতে গিয়ে তিনি নিজের প্রিয় ছাত্রকেই জীবনের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ক'রে তুললেন। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হ'তে পারে ?

সেই বিখ্যাত বোলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত প্রফেসর, আজ সমস্তই বিস্মৃত। শুধু তাঁর মনে বুকিওলোকে খুন্ করবার একটা প্রবল স্পৃহা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ালো। তিনি সশস্ত্রে এসে, নিজের বাড়ার দরজায় আঘাত ক'রতে থাকেন।

গিওভানা এবং বুকিওলো ঘরের মধ্যে পাশাপাশি বসে আগুন পোয়াতে পোয়াতে আলাপ করছিলো। দরজার গায়ে আঘাতের শব্দ শুনে গিওভানার বুঝতে বাকী থাকে না, তার স্বামী এসেছেন। কেননা দরজায় আঘাত করবার তাঁর একটা স্বতন্ত্র রীতি আছে। এটা কেবল তাঁরই পক্ষে সম্ভব। তাড়াতাড়ি বুকিওলোর হাত

ধরে এদিক পানে টেনে নিয়ে আসে। জড়করা অনেকগুলি কাপড়-জামার ভেতর ওঁকে লুকিয়ে রাখে। দরজার পাশে এসে প্রশ্ন করে—কে ?

—কে ? বুঝতে পারছোনা—কে ? শীগ্‌গির দরজা খোলো।

দরজা খুল্‌তেই প্রফেসর, খোলা-তলোয়ার হাতে ঘরে এলেন। গিওভানা ভয়ে চীৎকার করে, এর মানে কি ?

—এর মানে তো তোমার কাছেই। তুমি জানো, দুর্বৃত্ত এই বাড়ীর মধ্যে আছে ? আছে, নিশ্চয়ই আছে !

গিওভানা পরম বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে ব'ল্লে, তুমি ওসব কী যা' তা' ব'লছো ? তোমার মাথা কি খারাপ হ'য়ে গেলো ? হা' ভগবান ! শেষে তুমিও আমাকে সন্দেহ ক'রতে সুরু ক'রলে ?

এই ব'লে সে একটা আশ্চর্য্য উপায়ে আয়ত চোখ দু'টি থেকে অশ্রু জোর ক'রে টেনে আনে। তারপর ক্রন্দনজড়িতস্বরে বলে, এসো, এসো তুমি। খুঁজে দেখো সমস্ত বাড়ীখানা। যদি কাউকে বার ক'রতে পারো, তোমার ঐ তলোয়ারের ওপর আমি স্বেচ্ছায় ঝাঁপিয়ে প'ড়বো। নয়তো, ঐ তলোয়ারের সামনে দোবো মাথা পেতে।

ব'লেই গিওভানা চোখ মুছতে মুছতে পুনর্ব্বার বলে, তুমি কি মনে ক'রছো যে, আমি নিজের চরিত্রকে দূষিত, কলঙ্কিত ক'রতে সুরু ক'রেছি ? কেউ কোনো কালে যে বংশে খারাপ ছিলো না, কলঙ্কিত করেনি চরিত্র, সেই বংশের মেয়ে হয়ে, আমি নিজের চরিত্র ক'রবো অপবিত্র ? নিজেকে পরপুরুষের অঙ্কশায়িত ক'রবো ? এসব বলার আগেই যে আমার মরা উচিত ছিলো—হা' ভগবান !

বুকিওলো এবং তাঁর অধ্যাপক

কিন্তু প্রফেসর, স্ত্রীর কোনো কথায়ই কর্ণপাত করেন না। সমস্ত বাড়ীখানা তন্ন-তন্ন ক'রে অনুসন্ধান করেন। গিওভানা একটা বাতিদানে বাতিজ্বেলে স্বামীর পেছন পেছন আলো দেখিয়ে আসে। এবং পেছন থেকেই বলে, দেখো, আমার মনে হচ্ছে, কোনো অদৃশ্য-শয়তান তোমার কাঁধে ভর ক'রেছে। নইলে, তুমি হঠাৎ এই রকম অস্বাভাবিক ভাবে যেতেনা বদলে। তুমি আমাকে যতোটা সন্দেহ ক'রছো, তার অর্দ্ধেকও যদি আমি সন্দেহের ভাগী হতাম, তা' হ'লে আমি নিজের গলা নিজের হাতে টিপে কোন্‌দিন আত্মহত্যা ক'রতাম। আমি তোমাকে এই প্রার্থনা ক'রছি, শয়তানকে প্রশ্রয় দিও না—নিজেকে সন্দেহের বিরুদ্ধে দাঁড় করবার চেষ্টা করো। আমি অসতী, আমি দুশ্চরিত্রা—এ-কথা তুমি কী ক'রে ভাবতে পারলে! ছিঃ, আমায় তুমি সন্দেহ করো!

এই ব'লে হঠাৎ সে প্রফেসরের কণ্ঠদেশ নিজের একখানা হাত দিয়ে বেষ্টন ক'রলো।

সত্যি কথা ব'লতে কি, প্রফেসর কোথাও তাঁকে খুঁজে পান না। ভগবান্ বুকিওলোর প্রতি সদয়। প্রফেসর স্ত্রীর কথায়, আলিঙ্গনে, অভাবিতভাবে বদলে যান। এখন তাঁর মনে হয়, শয়তান নিশ্চয়ই তাঁরই ওপর ভর করেছে। মনে হয়, এ তাঁরই মনের ভুল, দৃষ্টির ভ্রম। নইলে, তন্ন-তন্ন ক'রে বাড়ীটা অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও বুকিওলোর সন্ধান পাওয়া যায় না কেন? স্ত্রীকে যে বৃথা সন্দেহ করেছেন, এখন তাঁর মনে এটাও সত্যি হ'য়ে ভেসে ওঠে। কোনো কথা না ব'লে তিনি নিজের শয়ন কক্ষে গিয়ে শয্যার ওপর শুয়ে পড়েন। এবং এটা নিরীক্ষণ

ক'রে গিওভানা ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে দরজাটায় চাবি দেয়। ফিরে এসে বুকিওলোকে সেই জড়ো করা কাপড়-জামার ভেতর থেকে, হাত ধরে টেনে বের করে।

পরদিন প্রভাতকালে। ঢং—ঢং ক'রে কলেজের ঘড়িতে দশটা বাজছে। বুকিওলো এই সবে এসে প্রফেসরের সম্মুখে বসেছেন। বলেন, স্যার কাল একটা ভারী মজার ব্যাপার হয়েছে। আপনি শুনে না-হেসে থাকতে পারবেন না।

শুনে প্রফেসরের মনের মধ্যে কালকের ঘটনা এক নিমিষেই প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি সহসা অস্বাভাবিকভাবে বারকয়েক মাথা নেড়ে চেয়ারের হাতল দু'টো, দু'হাত দিয়ে ঘষতে ঘষতে চড়াগলায় প্রশ্ন ক'রলেন, কী রকম—কী রকম মজার ব্যাপার? না-হেসে থাকতে পারবো না? কিন্তু, কেন,—কেন—কেন?

বুকিওলো নিজের আনন্দে এমনি মেতে উঠেছেন যে, প্রফেসরের বর্তমান মনের অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ক'রলেন। এ ছাড়া তাঁর মনের মধ্যে অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কোনো সন্দেহই স্থান পায়নি। তিনি তো ঘুণাক্ষরেও জানেন না যে, তাঁর গিওভানা অধ্যাপকের স্ত্রী!

বুকিওলো প্রত্যুত্তরে বলেন, গতরাত্রে আমি গিওভানার বাড়ীতে উপস্থিত হবার কিছুকাল পরে, ওর স্বামী এসে হাজির। বাপ্‌রে—

বুকিওলো এবং তাঁর অধ্যাপক

সে কী ক্রোধ তাঁর! সমস্ত বাড়ীটা তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়ালেন। কিন্তু আমি যে সম্প্রতি-কাচা পোষাক-পরিচ্ছদের গাদার মধ্যে লুকিয়ে ছিলাম, সে টুকু তাঁর খেয়াল হলো না। কাজেই আমাকে তিনি দেখতে পেলেন না। উনি বিফল মনোরথ হলেন এবং নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে প'ড়তেই, গিওভানা বাইরে থেকে ওঁকে চাবি দিয়ে আমাকে হাসতে-হাসতে সেই কাপড়-চোপড়ের ভেতর হ'তে বার ক'রলে। সমস্ত রাতটা স্যার কী আনন্দেই কাটলো! এমন আনন্দ এর পূর্ব্বে আমি আর পাইনি! মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড়ো আনন্দ বোধকরি আর কিছুই হ'তে পারে না।

এই পর্য্যন্ত ব'লে বকিওলো এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে পুনশ্চ ব'ল্লেন, আজো সন্ধ্যায় আমি গিওভানার কাছে যাবো, স্যার। যাবো এই জন্যে যে, ওর কাছে আমি যাবার কথা দিয়ে এসেছি!

তাঁর এই সারল্যভরা কথা শুনে প্রফেসরের অন্তরের ভেতরটা ঠিক্ জীবন্ত আগ্নেয় গিরির মতো ফুটতে থাকে। অসম্ভব ক্রোধে উর্ব্বর মস্তিষ্কটা বুঝি বিদীর্ণ হয়। কিন্তু অসম্ভব ধৈর্য্য সহকারে তিনি ক্রোধ সংবরণ ক'রে গম্ভীর স্বরে ব'ল্লেন, যাবার আগে আমাকে জানিয়ে যাবে। যাবে, নিশ্চই যাবে!

—সে কথা আর ব'লতে স্যার!

বুকিওলো বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রফেসর? তিনি দুশ্চিন্তায় মগ্ন হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করবার প্রবল আগ্রহে, কেমন যেনো হয়ে পড়েন। কলেজে শত চেষ্টা ক'রেও ছাত্রদের পড়াতে পারেন

না। সমস্ত দিনটাই অস্ত্র হাতে ক'রে হিংস্র শ্বাপদের মতো ঘুরে বেড়ান।

তারপর? তারপর আসে সেই মুহূর্ত্তটুকু—সেই সন্ধ্যাবেলা।

বুকিওলো যাবার পূর্ব্বে প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করেন। প্রফেসর বলেন, যাচ্ছো তা' হ'লে? বেশ যাও। কিন্তু কাল ভোরবেলা আমার সঙ্গে আবার দেখা ক'রো। আমি জানতে চাই—কতোদূর তুমি এগিয়ে গেলে।

—নিশ্চয়ই স্যার। কাল আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে আজকের সমস্ত ঘটনা প্রকাশ ক'রবো।

বুকিওলো বেরিয়ে এলেন। এবং প্রফেসর বিলম্ব না ক'রে সঙ্গেসঙ্গেই তাঁকে অনুসরণ করতে থাকেন। আজ তাঁর উদ্দেশ্য—গিওভানার বাড়ীতে প্রবেশ করার মুহূর্ত্তেই বুকিওলোকে হাতে-হাতে ধরা।

কিন্তু যে সব নারীরা পূর্ণ-যৌবনাবস্থায় বৃদ্ধ স্বামীকে প্রতারণা ক'রে যুবাপ্রেমিকের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে, তারা সব সময়ই সতর্কতা অবলম্বন ক'রে থাকে। পাছে কেউ জানতে পারে, পাছে তার স্বামী তাকে দুশ্চরিত্রা ব'লে ধরে ফেলে। গিওভানার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয় না। বুকিওলো ভেতরে প্রবেশ করবার

সঙ্গেসঙ্গেই, সে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়। প্রফেসর এক মিনিটের মধ্যে দরজার কাছে এসে দাঁড়ান। বুকিওলোকে সঙ্গেসঙ্গে ধরতে পারলেন না ব'লে, তাঁর সর্ব্বশরীর অধিকতর ক্রোধে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি দরজার ওপর প্রচণ্ড ঘুসি মারতে থাকেন।

গিওভানার কানে সেই শব্দ আসে। মুহূর্ত্তের মধ্যে আলো নিবিয়ে দরজার পাশে বুকিওলোকে দাঁড় করায়। তারপর দরজা সশব্দে খুলতেই প্রফেসর উত্তেজনায় ঘনঘন নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ভেতরে আসেন।

গিওভানা পলকের মধ্যে স্বামীর কণ্ঠ তার দু'টি মৃণালভুজের সাহায্যে বেষ্টন ক'রে এমনি ভাবে আড়াল ক'রে দাঁড়ায়, যে, তিনি দরজার পাশের ব্যক্তিটিকে আদৌ দেখতে পান না। অধ্যাপক স্ত্রীর আবেষ্টন থেকে নিজেকে জোর ক'রে মুক্ত করেন! ক্ষিপ্রগতিতে সুমুখ দিকে এগিয়ে যান। এবং সেই অবসরে বুকিওলো তাঁর অজ্ঞাতে দরজার পাশ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েন। প্রফেসর সীমাহীন উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কোষমুক্ত তলোয়ার মাথার ওপর দিয়ে বন্-বন্ শব্দে ঘুরিয়ে চীৎকার করেন, খুন ক'রবো। কেটে টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলবো। মাংস টুকরো, কুকুর দিয়ে খাওয়াবো। দুষমন, বেইমান কোথাকার!

কাণ্ড দেখে গিওভানা চীৎকার ক'রে পাড়ার লোক বাড়ীতে জড়ো ক'রলো। এবং তাদের সম্মুখে ব'ল্লো, আমাকে রক্ষা করো। আমার স্বামী পাগল হ'য়ে গিয়েছে। অত্যন্ত পড়াশোনার জন্যে, ওঁর মাথায় আর কিছু নেই।

পাড়ার লোক সত্যিই দেখে, অধ্যাপক, সেই শান্তিপ্রিয় অধ্যাপক, অস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করেছেন। গিওভানার কথা তারা বিশ্বাস না ক'রে পারে না। বলে, প্রফেসর, আপনি স্থির হোন। আসুন, আপনাকে কৌচে শুইয়ে দি'। আপনি বিশ্রাম করুন।

প্রফেসর বলেন, বিশ্রাম? অসম্ভব। হ্যাঁ অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার স্ত্রীর ঘরেতে আসতে তাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি!

গিওভানা প্রতারণার মুখোস প'রে বলেন, আমি দুশ্চরিত্রা? হা' ভগবান, এও তোমার মুখ থেকে আমায় শুনতে হলো? আমার সমস্ত বন্ধু-বান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশিদের জিগ্যেস ক'রে দেখো—কোনো দিন, কোনো দুর্বল মুহূর্ত্তেও তারা আমার চরিত্রে তিলমাত্রও কলঙ্ক রেখা দেখতে পেয়েছে কিনা।

এই কথায় পাড়া-পড়শীরা একসঙ্গে প্রফেসরকে ব'ল্লে, স্যার, আপনি স্থির হোন! স্ত্রীর চরিত্রে আপনি মিথ্যে সন্দেহ ক'রছেন। আমরা এই পাড়ায় বহুদিন আছি! আমরা জানি, আপনার স্ত্রী গিওভানার মতো পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোক, দু'টি নেই! উনি ফুলের মতোই পবিত্র—কলঙ্কের কোনো রেখাই ওঁর চরিত্রে নেই।

কিন্তু প্রফেসরের সেই এক কথা—কী ক'রে তা' হতে পারে? আমি তাকে এখানে আসতে স্বচক্ষে দেখেছি। সে এখানে আছে। নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে!

গিওভানার দু' ভাই এলেন। এঁদের আগমন সত্যিই

অপ্রত্যাশিত। ভগ্নি আকুল হ'য়ে কেঁদে ওঠে। ক্রন্দনজড়িত-স্বরে বিনিয়ে বিনিয়ে বলে, আমার কী সর্ব্বনাশ হ'ল। তোমাদের ভগ্নিপতি একেবারে পাগল হ'য়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়। আমার ঘরে দ্বিতীয় পুরুষ মানুষ আছে, এই অপবাদ তিনি দিচ্ছেন। কিন্তু তোমরা জানো, ভালো ক'রেই জানো, কি ধাতের তোমাদের বোন্ আমি।

ভগ্নির কথায় দু'-ভাই অধ্যাপককে ভৎর্সনা ক'রে উঠলেন।:— আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'চ্ছি। শুধু আশ্চর্য্য নয়—সত্যিই আমরা আন্তরিক দুঃখিত। এতোদিন নিঃসন্দেহে এবং শান্তিতে ঘর-সংসার ক'রবার পর, আপনি হঠাৎ আমাদের বোনের বিরুদ্ধে এ-রকম সন্দেহ—এমনি জঘন্য সন্দেহ, নিজের মনে পোষণ ক'রছেন! কিন্তু কেন?

প্রফেসর তখনো রাগে ফুলছেন। বলেন, দেখেছি, আমি নিজের এই বড়োবড়ো চোখ দিয়ে দেখেছি—একটা সুন্দর, ফুটফুটে ছোক্‌রাকে ঘরে ঢুকতে। সে আছে, এখানেই আছে।

—তবে আসুন, আমরা সকলে ভালো ক'রে খুঁজে দেখি। সেই ছোক্‌রাটাকে যদি বার ক'রতে পারি, তবে গিওভানাকে আপনার ইচ্ছেমতো শাস্তি আমরাই দিয়ে যাবো।

এই ব'লে সমবেত প্রতিবেশিদের মধ্যে একজন প্রফেসরের মুখপানে চায়।

গিওভানার এক ভাই, ভগ্নিকে এদিক পানে এনে জিজ্ঞাসা করেন, গিওভানা, সত্যি ক'রে আগে বলো, কারুকে তুমি এই বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছো কিনা! সত্যি—সত্যি কথা ব'লবে।

—ভগবানের দিব্যি! আমার ঘরে কেউ নেই। পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমালাপ করার দুরভিসন্ধি হবার আগেই যেনো আমার মৃত্যু হয়। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, তুমি আমার ভাই হ'য়ে কী ক'রে এ-কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ ক'রলে? তোমার বোন্ আমি। আমার কলঙ্ক, তোমাদেরও কলঙ্ক! আমাকে ও কথা জিগ্যেস করার আগে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত ছিলো। পরপুরুষকে ডেকে এনে আমি এ-বাড়ীকে কলঙ্কিত ক'রবো—আমার পূজনীয় স্বামীর অপমান ক'রবো? শেষে তোমরাও আমাকে সন্দেহ ক'রতে সুরু ক'রলে? হা ভগবান্! এখনো আমি বেঁচে আছি!

গিওভানার চোখ দিয়ে এবার শ্রাবণের ধারা বয়।

ভগ্নির উক্তিতে দু'-ভাই মনে মনে সন্তুষ্ট। কিন্তু সমবেত সকলের সামনে তাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ প্রমাণ করাবার জন্যে, প্রফেসরের সঙ্গে সারা বাড়ীটা অনুসন্ধান ক'রে বেড়ালেন। কিন্তু কাকেও দেখা গেলো না। অধ্যাপক একস্থানে এসে দেখলেন, অনেকগুলি পোষাক টেবিলটার ওপর জড়ো করা অবস্থায় পড়ে। তিনি তৎক্ষণাৎ তলোয়ার চালিয়ে মূল্যবান বস্ত্রগুলি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেললেন। তাঁর মন কিন্তু আনন্দে নেচে ওঠে। কেননা তিনি মনে ক'রছেন, বুকিওলোকেই তরবারির আঘাতে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলছেন।

প্রফেসরের কীর্ত্তি দেখে সকলের নিঃসংশয়ে ধারণা হ'লো, তাঁর মাথায় আর কিছু নেই! গিওভানার ভাইয়েরা বল্লেন,

বুকিওলো এবং তাঁর অধ্যাপক

প্রফেসর আপনি অনেকদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়েছেন। এতোটা এগোনো আপনার কোনো মতে উচিত হয় নি। আমাদের ভগ্নি গিওভানার প্রতি আপনার এই অশিষ্টাচার কোনো মতেই সহ্য করা যায় না। আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আপনি উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছেন। এবং এই জন্যেই, আপনাকে ক্ষমা করা গেলো।

—ক্ষমা, আমাকে ক'রবে তোমরা ক্ষমা? কী ক্ষমতা আছে তোমাদের ক্ষমা করবার? যে দোষী, সে পেয়ে গেলো পার। আর আমি সেই আসামীকে ধ'রতে এসে হ'য়ে গেলাম ক্ষমার পাত্র, হ'য়ে গেলাম উন্মাদ? তোমরা—তোমরা সকলে ষড়যন্ত্র ক'রে সেই দুর্বৃত্ত ছোক্‌রাটাকে রেখেছো লুকিয়ে। বার করো শিগ্যির তাকে। আমার সুমুখে বার ক'রে দাও। নইলে, এই তলোয়ারের ঘায়ে তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত দর্শন ক'রবো।

উন্মত্ত প্রফেসর তলোয়ার শূন্যের ওপর আস্ফালন করেন। তখন সকলে একসঙ্গে নিজেদের হাতের লাঠি ব্যবহার না ক'রে পারে না। দু'-চার ঘা লাঠি প্রফেসরের পিঠের ওপর এসে পড়ে। তাঁর তলোয়ার ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। সকলে তাঁকে লোহার শেখলের সাহায্যে বেঁধে ফেল্লেন। এ অবস্থায় তিনি নির্জীবের মতো ঘরের এক কোণে পড়ে থাকেন।

দুঃসংবাদ কখনো চাপা থাকে না। বোলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপকের মস্তিস্ক বিকৃতির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো!

কলেজের ছেলেরা শুনে মর্ম্মান্তিক দুঃখে অভিভূত। তারা একসঙ্গে অধ্যাপককে দেখতে যাচ্ছেন, এমন সময় বুকিওলো এলেন কলেজে। তিনি এসব কিছুই জানেন না। গতরাত্রে তাঁর প্রেমাভিযানের ফলাফলের কাহিনী তিনি প্রফেসরকে আজো জানাতে এসে ছিলেন।

কিন্তু এখন শুনে মন তাঁরও খারাপ হ'লো।

অধ্যাপককে তিনি পিতার মতো সম্মান করেন, ভক্তি করেন—ভালোবাসেন! আজ সেই ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিকৃতির অশুভ সংবাদে বুকিওলোর চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হ'য়ে ওঠে! তিনিও অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপককে দেখতে যান।

অধ্যাপকের বাড়ীতে পদার্পণ ক'রে বুকিওলো চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেন। তাই তো! এই স্থানটি যে তাঁর জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতার স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে। বুকিওলোর বুকটা আজ হঠাৎ দুর্‌-দুর্‌ ক'রে উঠলো। এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর চক্ষে জলের মতো পরিষ্কার হ'যে যায়।

কিন্তু পাছে সঙ্গের সাথীরা সত্যি কথা বুঝতে পারে, এই ভয়ে বুকিওলো সকলের সঙ্গে ঘরের ভেতর এলেন। এসে দেখেন, তাঁর অধ্যাপক নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হ'য়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় নিজের শয্যার ওপরে স্থির হ'য়ে পড়ে আছেন। অন্যান্য ছাত্ররা তাঁর শয্যার চারিধারে ঘিরে তাঁর ঐ মর্ম্মস্পর্শী অবস্থার জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ ক'রে চলে যাবার পর, বুকিওলো নিতান্ত অপরাধীর মতো তাঁর সুমুখে এসে দাঁড়ান। সজল চক্ষে বলেন, স্যার, আমার বাবার মতো আমি আপনাকে ভক্তি ক'রি, সম্মান করি।' আমাকে দিয়ে

বুকিওলো এবং তাঁর অধ্যাপক

আপনার যদি কোনো উপকার হয়, ব'লুন! আপনার ছেলের মতো আমি তাই পালন ক'রবো।

প্রফেসর ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে ব'ল্লেন, না, বুকিওলো! আমার আর কিছু আদেশ করবার নেই। তুমি যাও! শান্তিতে তুমি ফিরে যাও। আমার নিজের অনন্ত ক্ষতির ওপর ভিত্তি ক'রে, তুমি পেয়েছো প্রচুর অভিজ্ঞতা। তুমি যাও।

তিনি বোধকরি আরো কি ব'লতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী বাধা দিয়ে বুকিওলোকে ব'ল্লো, এ-সব বাজে কথায় কান দেবেন না। দেখছেন না, লোকটার মাথার কোনো ঠিক নেই?

শুনে বুকিওলোর মনে হয়, তাঁর নিজের হৃদয়ে কে যেনো সহস্র সূচের অগ্রভাগ দিয়ে বিদ্ধ ক'রে দিলো। তিনি মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে গিওভানার দিকে চাইলেন এবং পরক্ষণেই অধ্যাপকের কাছ থেকে শেষ-বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

পিট্রোপোলোর বাসায় এসে বুকিওলো ধরা গলায় ব'ল্লেন, ভাই, পিট্রো! আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন। ব'ল্লেন, আমার আর তোমার জন্যে অপেক্ষা করার উপায় নেই। আমি আজই স্বদেশে, আমার রোম নগরীর

উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বো। কেন না, আমি পরের ক্ষতি ক'রে, নিজের অভিজ্ঞতার খাতায় অনেক—অনেক সঞ্চয় ক'রেছি। আমার জীবনে এই পাপের বোঝা স্বেচ্ছায় নির্ব্বোধের মতোই কাঁধে তুলে নিয়েছি। ভগবানের কাছে আমার এই একমাত্র প্রার্থনা, তিনি যেনো আমাকে এর জন্যে কোনো দিন ক্ষমা না করেন।

ক্যান্‌ডিয়ার শেষ-পরিণতি

-এক-

ইষ্টারের বিরাট ভোজের তিন দিন পর :—

ল্যামোনিকা পরিবারে এই ইষ্টার উপলক্ষ্যে, প্রতি বছরই একটা বেশ বড়ো গোছের ভোজের আয়োজন হয়। এটা ল্যামোনিকা পরিবারের একটা চিরকালের প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক পর্ব্ব-উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হন এবং প্রচুর আহারাদির পর যে-যার নিজের গৃহে ফিরে যান। ল্যামোনিকা পরিবারের গৃহকর্ত্রী ডোনাক্রিশ্চিনা ল্যামোনিকা, ব্যবহাব করা টেবিল-ক্লথ, তোয়ালে, ডিস, কাঁটা এবং রূপোর বাসন-কোশন গুণে-গুণে একে একে যথাস্থানেই তুলে সাজিয়ে রাখছেন। উদ্দেশ্য, আগামী বছরে ইষ্টারের সময়ে এগুলি আবার কাজে লাগানো।—

ডোনাক্রিশ্চিনাকে এই কাজে সাহায্য ক'রছে, তাঁর গৃহের পরিচারিকা—মেরিয়াবিসাকিয়া। রজকী ক্যান্‌ডিডা মারকান্‌ডা ওরফে ক্যান্‌ডিয়াও ক'রছে সাহায্য। মেঝের ওপরে রয়েছে সারি-সারি অনেকগুলি

বাস্কেট্। প্রতি বাস্কেট্টি জামা কাপড়ে পরিপূর্ণ। একটা বাস্কেট্ থেকে টেবিল-ক্লথ, ঝাড়ন, তোয়ালে তুলে নিয়ে ক্যান্‌ডিয়া গৃহকর্ত্রীকে একবার স্মরণ করিয়ে দিলো—কোনো জিনিষ-ই হারায় নি, সব ঠিক্ আছে। এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার পর, সে তার হাতের জিনিষগুলি মেরিয়ার হাতে তুলে দেয়। মেরিয়া আবার সেগুলি পরম যত্নে ড্রয়ারের ভেতর ভরে রাখে। গৃহকর্ত্রী ল্যাভেনডার ছড়িয়ে দেয়, এবং পরে একখানা খাতার মধ্যে এর সংখ্যা টুকে রাখেন।

ক্যান্‌ডিয়ার চেহারাটা লম্বা এবং রোগা। বয়েস পঞ্চাশের ধার ঘেঁসে গিয়েছে। সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছে। হাত দু'টি দেহের অনুপাতে লম্বা। মেরিয়া, অরটোনার বাসিন্দে। চেহারা মোটা। এর গায়ের রঙ পরিষ্কার। চোখ দু'টি মনোরম। কথা বলার পদ্ধতিটা ভালো। মেজাজটা শান্ত। ডোনাক্রিশ্চিনাও অরটোনার অধিবাসী। এর দেহের গঠন খর্ব্ব। সরল নাক। সমস্ত মুখখানা ছুলির দাগে ভরা। চোখের সৌন্দর্য্য বিশেষ ক'রে নজরে পড়ে। কিন্তু দাঁত বড়ো অপরিষ্কার, নোংরা।

অপরাহ্ণের অধিকাংশ সময়টা এই তিনটি মহিলার, এই বস্তুগুলিকে কেন্দ্র ক'রেই কেটে গেলো। ক্যান্‌ডিয়া তাঁর শূন্য বাস্কেটটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার উপক্রম, ক'রতেই, রূপোর চামচে গুনতে গুনতে ডোনাক্রিশ্চিনা হঠাৎ মেরিয়াকে সম্বোধন ক'রলেন: মেরিয়া,

ক্যানুডিয়ার শেষ-পরিণতি

মেরিয়া! গোণো—গোণো এ গুলো। নিজে গুণে দেখো।· একটা চামচে? কোথায় গেলো সেটা? কী মুস্কিল! শেষকালে রূপোর চামচেটা হারালো?

মেরিয়া বিস্মিত হলো: তা কী ক'রে হ'তে পারে। না—এ অসম্ভব, মা'। আচ্ছা, আমি একবার দেখি!

এক, দুই, তিন—মেরিয়া গুণতে থাকে। ডোনাক্রিশ্চিনা সেদিকে চোখ রেখে, মাথা নাড়েন।

গোণা শেষ ক'রে মেরিয়া হতাশ ভাবে ব'লে ওঠে: তাইতো! সত্যিই তো একটা কম। কী হবে?

তার দিক দিয়ে, সে সম্পূর্ণ সন্দেহের বাইরে। আজ পনেরো বছর ধ'রে ও এ-বাড়ীতে কাজ ক'রে আসছে। কখনো একদিনের জন্যেও মনিবের সন্দেহ-চক্ষে পড়েনি। আর পড়বেই বা কেন? সে যে প্রকৃতই বিশ্বাসী, এর অনেক পরিচয় গৃহ-কর্ত্রী পেয়েছেন। ডোনাক্রিশ্চিনার বিয়ের পর, ওঁর সঙ্গেই অরটোনা শহর থেকে সে এ বাড়ীতে এসেছে। এক রকম ব'লতে গেলে, মেরিয়াই ডোনাক্রিশ্চিনার বিয়ের ফুল ফুটিয়েছে। প্রথম থেকেই মেরিয়ার, ল্যানোনিকা পরিবারের ওপর একটা বিশেষ আধিপত্য দেখা যায়। এই আধিপত্যের আসলে কিন্তু ঐ ডোনাক্রিশ্চিনা।

ডোনাক্রিশ্চিনা ব'ল্লেন: ভালো ক'রে বাইরেটা দেখে এসো দিাকনি। মেরিয়া তখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রান্না ঘরের প্রতি স্থানে তন্ন-তন্ন ক'রে খুজে দেখে। চামচে—রূপোর চামচে কিন্তু কৈ? বারান্দায়

আসে! এদিক ওদিক্ ভালো ক'রে দেখে। কিন্তু চামচে পায় না। শূন্য হাতে ফিরে আসে ও। বলে: না, কোথাও পাওয়া গেলো না তো!

দু'-জনে তখন চোখ বুজে স্মরণ করবার চেষ্টা করেন, কোথাও চামচেটা ফেলে এসেছেন কিনা। ওরা বারান্দা ডিঙিয়ে ওদিক পানে এসে দাঁড়ায়। বারান্দার ওদিকটা রজকদের কাপড় কাচবার জায়গা। এখানে অনুসন্ধান করা হলো। কিন্তু বৃথা—নিষ্ফল।

জিনিষটা পাওয়া না যাওয়াতে ওদের দু'জনকে বেশ চড়া গলায় এই নিয়ে আলোচনা করতে শোনা গেলো। পাশাপাশি বাড়ীর বাতায়ন ক'টি হঠাৎ খুলে যায়। এর ফাঁক দিয়ে গুটিকয়েক নারীমূর্ত্তি মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে: কী হয়েছে, ডোনাক্রিশ্চিনা? অতো চেঁচামেচি কেনো গো?

মেরিয়া এবং ডোনাক্রিশ্চিনা হাত মুখ নেড়ে ব্যাপারটা খুলে বলে। শুনে ওরা বলে: কী সর্ব্বনাশ! এখানেও তা হ'লে চোরের উপদ্রব স্থরু হয়েছে?

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য রকমের সাড়া পড়ে গেলো সমস্ত শহরটায়। বিষয়-বস্তু, এই রূপোর চামচে। এই চামচে চুরির আসামী কে হ'তে পারে, সেই নিয়ে বেশ একটা গবেষণা চলে। কথাটা ফেনিয়ে যখন অগস্টিনোতে গিয়ে পৌছলো, তখন ওর চেহারা গেলো বদলিয়ে। চামচে, শুধু চামচেই যে চুরি গিয়েছে এটাতে কেউ তখন আর আস্থা রাখলো না। ল্যামোনিকা পরিবারের একটা

চামচে নয়—সমস্ত রূপোর থালা গুলি পর্য্যন্ত চোরের হাতে প'ড়ছে, মানে চুরি করেছে। এমনি ব্যাপার।

পাড়ার গিন্নারা অযাচিত হ'য়ে এসেছেন। বারান্দার ওদিক্ থেকে আসছে বাতাসের সঙ্গে ভেসে গোলাপের সৌরভ। ফুর্-ফুর্ ক'রে বাতাস বইছে। শিকে টাঙানো খাঁচায়, বন্দী গোটা কয়েক পাখী, মাঝে-মাঝে কুজন ক'বে উঠচে।

ডোনাক্রিশ্চিনা একসময়ে নিজের হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে ব'ল্লেন: কিন্তু কে চুরি ক'রলো, বলোতো?

ডোনা ইসাবেলা সারটেলের চাল-চলন অনেকটা শিকারী পশুর মতো। সে তার সারস পাখীর মতো দীর্ঘ ঘাড়টা বাড়িয়ে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলো: ডোনাক্রিশ্চিনা, তোমার সঙ্গে কারা ছিলো? আমার যেনো মনে হ'চ্ছে, আমি ক্যানডিয়াকে দেখেছিলাম·········

ডোনাফেলিসেটা মার্গাসান্টা বাধা দিয়ে অনর্গল ব'কে যায়: কী সর্ব্বনাশ তুমি এটা ভাবোনি? তুমি দেখনি? তা' দেখবে কেন! তুমি ওকে সন্দেহ করো না? সন্দেহ করো না এই জন্যে যে, তার পক্ষে এ কাজ অসম্ভব? হুঁ অসম্ভব! অসম্ভব আবার কি? মানুষকে কখনো বিশ্বাস করা যায়? কি বলো তুমি ডোনা ইসাবেলা? কী ব'ল্লে, মানুষকে কখনো বিশ্বাস করা যায় না? হ্যাঁ ঠিক্ ব'লেছো।

তোমার দেখছি বেশ অভিজ্ঞতা আছে! কী—তুমি ক্যান্‌ডিয়ার সম্বন্ধে কিছুই জানো না? কিন্তু আমি জানি! আমি তার বিষয়ে অনেক কিছু ব'লতে পারি।

আর একজন ব'লে ওঠে: সে কাপড় কাচে চমৎকার। এর বিরুদ্ধে কিছু বলা যায় না। আমি কখনো লোকের নামে মিথ্যে অপবাদ দিইনে বাবা! যেমনটি দেখেছি, ঠিক্ তেমনটি ব'লবো। একটু বাড়িয়ে নয়।

একটু দম নিয়ে পুনর্ব্বার বলে: সারা পেসকারা শহরটা ঘুরে এলেও ওর মতো ধোপানী পাওয়া যাবে না। এটা কিন্তু মিথ্যে নয়। তবে কথা হচ্ছে এই—ওর হাত-টানটা উপেক্ষা করা যায় না কোনো মতেই! কি বলো তুমি?

এই ব'লে সে অপর এক জনকে সালিশী মানতে চায়।

সে হাত মুখ নেড়ে বলে: কী ব'লবো ভাই! ক্যান্‌ডিয়া মাগীর পেটে-পেটে যে এতো চুরির ফন্দি পাক দিয়ে আছে, কী ক'রে জানবো বলো? আমি ভাই—সাতেও নেই, পাঁচেও নেই! মাগী একদিন এসে হাতে পায়ে ধ'রে কাপড় কাচতে নিয়ে গেলো। আহা! গরীব মনিষ্যি! পায় না দু'-টো পয়সা! এই ভেবে তোয়ালে, রুমাল, গাউন দিলাম কাচতে। কিন্তু সেই যে নিয়ে গেলো ব্যস! আর দেখা নেই।

ডোনাক্রিশ্চিনা বলেন: কিন্তু এবার ওকে আমি ছাড়িয়ে দোবো। কাকে রাখি বলতো? এমন কে বিশ্বাসী আছে? সিল্‌ভেষ্ট্রা মনে হয় ভালো লোক! তোমার কি মনে হয়, ডোনা ইসাবেলা?

—সিল্‌ভেষ্ট্রা? সিল্‌ভেষ্ট্রা ভালো লোক? আহা মরে যাইরে! শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! বদমায়েস—ওটা হাড় বদমায়েস।

—তবে এন্‌জেল্যান্‌টোনিয়া?

—না। সে ও সুবিধের নয়।

ডোনাক্রিশ্‌চিনা একটু ভেবে নিলেন।

ব'ল্লেন: মরুগ্‌গে। নেবু, বেশী না কচ্‌লানোই ভালো।

—এবার না হয় চামচের ওপর দিয়েই গেলো। ভবিষ্যতে তো বেশী কিছু যেতে পারে—তখন? না না, ডোনাক্রিশ্‌চিনা—তুমি এ-ব্যাপারটাকে উপেক্ষা ক'রোনা।

—উপেক্ষা ক'রি আর নাই করি—সেটা আমারই বিবেচ্য, ডোনা ইসাবেলা।

—দুই—

পরদিন সকালবেলা। ক্যান্‌ডিয়া একটা গামলা ভর্ত্তি কাপড় কাচ ছিলো এক-মনে। হঠাৎ মুখ তুলতেই দেখে:—গাঁয়ের পুলিশ কন্সটেবল্‌ বিয়াগিওপেসি ওর দরজার সুমুখে দাঁড়িয়ে।

ব'ল্লে: মাননীয় মেয়র-সাহেব তাঁর দরবারে তোমাকে এখুনি যেতে আদেশ ক'রেছেন।

ক্যান্‌ডিয়ার মুখে-চোখে বিরক্তির রেখা উঠলো ফুটে। কাজ ক'রতে ক'রতে ভ্রূ-কুঁচকিয়ে বলে: কী ব'ল্লে?

—মাননীয় মেয়র-সাহেব তাঁর দরবারে তোমাকে এখুনি যেতে আদেশ ক'রেছেন।

ক্যান্‌ডিয়া এর জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলো না। মেয়র তাকে ডেকে পাঠাতে যাবে—এটা সে কল্পনাও ক'রতে পারিনি। না পারবারই তো কথা। গরীর মানুষ বেচারা! মাথার ঘাম, পায়ে ফেলে পেট চালায়; তাকে আবার কী প্রয়োজন থাকতে পারে মেয়র-সাহেবের! দৃঢ়স্বরে প্রশ্ন ক'রলো: আমাকে ডাকছেন? কিন্তু কেন? কিসের জন্যে? .

—আমি ওসব ব'লতে পারিনে। আমার ওপর যা' হুকুম হ'য়েছে তাই তোমায় ব'লেছি।

—হুকুম? কেন তাঁর হুকুম মতো চ'লবো? আমি কী দোষ ক'রেছি যে, মেয়র-সাহেবের এই গরীবের দিকে নজর পড়েছে? না, আমি যাবো না। কিছুতেই যাবোনা। কেন যাবো? আমি তো কোনো অপরাধ ক'রিনি!

ক্যান্‌ডিয়ার এই কথায় কন্সটেবলের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো: কী এতো বড়ো স্পর্দ্ধা? যাবে না? আচ্ছা দেখে নোবো তোমায়। আমার কথা অমান্য করা? আরে কি আমার ধোপানীরে! যাবে না? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা তোমায়!

একটা অপরিসর রাস্তার একধারে ক্যান্‌ডিয়ার মাথা গোঁজবার সামান্য আশ্রয়। পথচারীরা পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালো সেখানে। উঁকি মেরে দেখলো—সে উত্তেজনাবশে খুব জোরে জোরে কাপড় আছড়ায়। ওরা মুখটিপে হাসে। ওকে উদ্দেশ ক'রে

ক্যান্‌ডিয়ার শেষ-পরিণতি

দু'-চারটে বিদ্রূপ-বাণী বেরিয়ে আসে ওদের মুখ দিয়ে। ক্যান্‌ডিয়ার সে সব কথার অর্থ মাথায় ঢোকে না। শুধু চোখ-মুখ লাল ক'রে নিজের কাজ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে, আরো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ক'রে যায়। কিন্তু কী জানি কেন হঠাৎ ওর সাহস যায় বেড়ে, যখন ও দেখে বিয়াগিও পেসিকে আর একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর সঙ্গে আবার তার বাড়ীর দরজায় আসতে।

বিয়াগিওপেসি গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে ব'ল্লো: চলো। চলো আমাদের সঙ্গে।

ক্যান্‌ডিয়া কোনো কথা ব'ল্লে না। হাত মুছে রাস্তা দিয়ে ওদের অনুসরণ ক'রতে লাগলো।

দু'-জন পুলিশ কর্ম্মচারীর পেছনে ক্যান্‌ডিয়াকে যেতে দেখে, ওর বড়ো শত্রু, রোসাপান্নরা তার দোকানের দরজার ওপর দাঁড়িয়ে মুখ বাড়ায়। ক্যান্‌ডিয়াকে লক্ষ্য ক'রে বিদ্রূপ-হাস্যে ব'লে ওঠে: কী গো—শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছো? কেন বাবা বুড়ো বয়েসে আবার এসব পাগলামি! চুরির মালটা বার ক'রে দাওনা বাবা।

ক্যান্‌ডিয়া এই লাঞ্ছনার কোনো যুক্তি খুঁজে পেলে না। ওর মুখ দিয়ে, এই অপবাদ খণ্ডন ক'রবার, কোনো কথাই ফুটলো না।

মেয়রের আপিসের সুমুখে কয়েকজন লোক ছিলো জড় হয়ে। ওদের দেখে মনে হয়—এ-বিশ্বে পরের লাঞ্ছনা উপভোগ করাই একমাত্র ওদের জীবনের লক্ষ্য।

ক্যান্‌ডিয়া এদের প্রতি ফিরেও চাইলো না। ব'সে কাঁপতে কাঁপতে সে সিঁড়ির ধাপগুলি এক নিমেষেই পেছনে ফেলে এসে, একেবারে মেয়রের সামনে এসে দাঁড়ালো! হাঁপাতে হাঁপাতে বলে: আপনি কি চান? কা চান আপনি আমার কাছ থেকে?

ডন্‌সাল্লা লোকটা মনে হয় একটু শান্ত প্রকৃতির। রজকিনীর ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রশ্নে, বিরক্ত হলেন। কিন্তু নিজেকে সংযত ক'রে তাঁর সুমুখে উপবিষ্ট দু'-জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর দিকে তাকিয়ে নিজের পকেটে হাত দিলেন।

একটা নস্যির কৌটো থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে ক্যান্‌ডিয়াকে ব'ল্লেন: বসো মা, তুমি বসো।

কিন্তু ক্যান্‌ডিয়ার আসন গ্রহণ ক'রবার কোনো লক্ষণ দেখা গেলোনা। তার টিয়াপাখীর ঠোঁটের মতো লম্বা নাকের ছোটো ছোটো রন্ধ্র দু'-টি অসম্ভব রাগে একবার স্ফীত এবং আর একবার সঙ্কুচিত হ'তে লাগলো। ব'ল্লে: আপান কি জন্যে আমাকে ডেকেছেন?

মেয়র ডন্‌সাল্লা ব'ল্লেন: কাল ডোনাক্রিশ্চিনার ওখানে কাপড় দিতে গিয়েছিলে?

—গিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই গিয়েছিলাম। কিন্তু কী দোষ হ'য়েছে তাতে? কোনো কাপড় কি খোয়া গিয়েছে? না যায়নি। একখানাও খোয়া যায়নি। গুণে-গুণে, একটা একটা ক'রে গুণে-গুণে সমস্ত মিলিয়ে নিয়েছে! কিন্তু এখন আবার সে-কথা কেন? ..

ক্যান্‌ডিয়ার শেষ-পরিণতি

—দাঁড়াও, সব ব'লছি।

মেয়র আর একটিপ্ নস্যি দেন নাকে। বলেন: ঘরের টেবিলের ওপর অনেকগুলি রূপোর চামচে ছিলো। ডোনাক্রিশ্চিনা খুব ভালো ক'রে হিসেব ক'রে দেখেছেন—একটা রূপোর চামচে গুনতিতে মিলছে না। কম পড়েছে। কিন্তু আমি ব'লতে চাই কি, ভুল ক'রে হয়তো তুমি চামচেটা নিয়েছো। কিছু মনে ক'রোনা তুমি। এটা একটা—মানে, কথার কথা আর কি—বুঝলে?

ক্যান্‌ডিয়ার এবার বুঝতে বাকী রইলো না। সেই হারানো রূপোর চামচেটা সে ক'রেছে চুরি? চোর অপবাদে তার চরিত্র এরা ক'রছে কলঙ্কিত? ক্যান্‌ডিয়া—ক্যান্‌ডিয়া তো সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। পরের জিনিষ আত্মস্মাৎ করবার মতো হীন মন ওর নয়।

কাজেই চুরির অপবাদে ক্যান্‌ডিয়া রাগে দুঃখে একেবারে জর্জ্জরিত হয়ে উঠলো। অস্বাভাবিক উঁচুগলায় ব'ল্লে: আমি—আমি নিয়েছি? আমি? কে—কে বলে এ-কথা? আপনার কথায় আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হচ্ছি! আমি চোর? আমি? আমি?

ডন্‌সাল্লা বিচার করবার চেয়ারে দেহকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিলেন! ব'ল্লেন: তা' হ'লে তুমিই নিয়েছো—কেমন?

শুনে ক্যান্‌ডিয়া এবার সত্যিই বোমার মতো ফেটে পড়ে। ওর মুখ-চোখ দেখতে-দেখতে একটা অভূতপূর্ব্বরূপে রূপান্তরিত হ'য়ে ওঠে। হাত-দু'টি শূন্যে মাথার ওপর দিকে বারকয়েক আস্ফালন ক'রে

চীৎকার করে, আমি—আমি চোর? কখনোই না—কখনোই না! বিচার নেই। আপনার নেই বিচার। আশ্চর্য্য—আমি আপনার বিচার দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছি!

মেয়র বলেন: আচ্ছা তুমি এখন যেতে পারো। আমরা এ-বিষয়ে খোঁজ-খবর নোবো।

ক্যান্‌ডিয়া নেমে এলো তর্‌-তর্‌ ক'রে। মেয়রকে কোনো রকম অভিবাদন জানালো না। রাস্তায় প'ড়লো এসে। দেখলে—ভিড় জমে আছে। লোকের কথাবার্ত্তা শুনে বুঝতে পারলে, এরা প্রত্যেকেই ওর বিরুদ্ধে। কেউ ওর পক্ষে নয়। কিন্তু তবুও ক্যান্‌ডিয়া আপন মনে নিজের পক্ষ সমর্থন ক'রে, পথ চলতে লাগলো। বাড়ী এসে যখন পৌঁছলো, তখনো ওর রাগ পড়েনি।

কিন্তু এইবার মর্ম্মান্তিক যাতনায় ক্যান্‌ডিয়ার দু'চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুবিন্দু নিঃশব্দেই ঝ'রে পড়তে লাগলো: উঃ! এতো অপমান—এতো অবিচার।

সমস্ত দিনটা ক্যান্‌ডিয়া মন দিয়ে নিজের কাজ ক'রতে পারলে না। সব সময়ে মনের ভেতরটায় একটা অব্যক্ত বেদনা ওকে অস্থির ক'রে তোলে। সে চোর নয়। সে চুরি

করেনি—এই নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্যে তার প্রাণটা বেদনায় অধীর হ'য়ে ওঠে।

সন্ধ্যাবেলা ক্যান্‌ডিয়া এসে হাজির হয়—ডোনাক্রিশ্চিনার বাড়ী। নির্দ্দোষিতার প্রমাণ দেবার ওর ইচ্ছে। কিন্তু ডোনাক্রিশ্চিনার দেখা সে পায় না। দেখা হয়—মেরিয়ার সঙ্গে। একে সামনে দেখে ক্যান্‌ডিয়া হাত-মুখ নেড়ে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করে। মেরিয়া কিন্তু একটা কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে না। ধীরে ধীরে সে সরে যায়। এড়িয়ে যায় ক্যান্‌ডিয়াকে। হয়তো গোপনে, ওর অবস্থা দেখে হাসে।

কিন্তু ক্যান্‌ডিয়া এবার আসে একে একে তার বাবুদের বাড়ী। মানে, যাদের বাড়ীর সে কাপড় কাচে। তাদের প্রত্যেককে নিজের অদৃষ্টের কথা যায় ব'লে, একটি একটি ক'রে। নিজে চোর নয়; চুরি সে কখনো করেনি—এই কথাটাই সে কতো প্রকারেই না বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু যার ভাগ্য মন্দ, তার হাত থেকে মরা শোল মাছও পালিয়ে যায়। তার গলায় জলও বেঁধে হয় তো' ক্যান্‌ডিয়ার মতো দুর্ভাগা একটা দীন, সামান্য ধোপানীর কথা কে সত্যি ব'লে মনে ক'রবে? পয়সা—পয়সা! ক্যান্‌ডিয়ার কি পয়সা আছে?

ক্যান্‌ডিয়া এখন এটা অনুভব করে—সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়েই অনুভব করে। এ-জগতে সে গরীব, তাই সহায়হীন সে। এ-জগতে

সে ভাগ্যদোষে পরের পরণের কাপড় কাচে, তাই সে হীন। এ-জগতে নেই, কেউ নেই তার। কেউ ওর নির্দ্দোষিতা চায় না বিশ্বাস ক'রতে!

—তিন—

কিন্তু ব্যাপারটা ঐ খানেই শেষ হ'লোনা। সিনিগিয়ার ডাক পড়লো—ডোনাক্রিশ্চিনার বাড়ী।

সিনিগিয়া যাদুবিদ্যায় পাকা। অনেকের হারানো জিনিষের পুনরুদ্ধার এই নারীটার সাহায্যে হয়েছে। শোনা যায়, হাতুড়ে ওষুধ-পত্তরও ইনি দরকার হ'লে দিয়ে থাকেন। লোকে বলে, চোর ছেঁচোড়দের সঙ্গে ওঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে। নইলে, হারানো জিনিষ কী এতো চট্-পট্ ফিরে পাওয়া সম্ভব হ'তে পারে?

তা' যাই হোক, সিনিগিয়া, ল্যামোনিকা গৃহকর্ত্রীর আহ্বান উপেক্ষা ক'রতে পারলেন না। উনি এলেন। ডোনাক্রিশ্চিনা সমস্ত ঘটনাটা বুঝিয়ে দিয়ে পরিশেষে ব'ল্লেন: চামচেটা আমাকে পাইয়ে দাও দেখি। তোমাকে ভালোরকম পুরস্কার দোবো—বুঝলে?

—বেশ। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা সময় আমায় দিতে হবে। এর মধ্যে আপনি চামচে পাবেন—নিশ্চয়ই পাবেন।

আশ্চর্য্য! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই চামচেটা পাওয়া গেলো। পাওয়া

গেলো—ইঁদারার কাছে যে প্রাঙ্গণ আছে, সেই প্রাঙ্গণের একটা গর্ত্তের মধ্যে।

বাতাসের যেমনি গতি, সেই গতিতে এই সুসংবাদটা সমস্ত পেসকারায় ছড়িয়ে পড়লো। ক্যান্‌ডিয়ার কানেও সেটা পৌঁছয়। সে একটা মহাচিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে, এই আনন্দে সমস্ত রাস্তা ঘুরে আসে। ওর চেহারা যায় বদলিয়ে। কুব্জদেহ সোজা হয়। সমস্ত মুখখানি একটা পরিতৃপ্তির হাসিতে ভ'রে ওঠে। চোখের দৃষ্টি সরল এবং স্বচ্ছ। যাকেই পথে দেখতে পায়, তারই মুখে সোজাসুজি দৃষ্টিতে তাকায়। তার চোখের দৃষ্টি যেনো ব'লতে চায়—আমি তো ব'লে ছিলাম।

কাফের পাশ দিয়ে ক্যান্‌ডিয়াকে যেতে দেখে ফিলিপো লা' সেলভি মুচকি হেসে ওকে ভেতরে ডাকলে। ওকে ব'সতে দিয়ে একগ্লাস মদের হুকুম ক'রলে।

ফিলিপো লা' সেলভি ব'ল্লো: একগ্লাস মদ—আমারই মতো একগ্লাস মদ তোমার পাওয়া উচিত, নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত।

কাফের সুমুখে কতকগুলি বিশ্ব-নিন্দুক ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলো। এদের প্রত্যেকের মুখেই দুরভিসন্ধির রেখা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। ক্যান্‌ডিয়া মদের গ্লাসটি এক নিঃশেষে পান ক'রতেই, ফিলিপো লা' সেলভি একটা বিদ্রূপের হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে এনে, জনতার দিকে মুখ ক'রে ক্যান্‌ডিয়াকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্লে: কি ক'রে সবদিক

সামলাতে হয়, ও তা' জানে। নয় কি? চালাক, ভারী চালাক এ—না?

এই ব'লে সে ক্যান্‌ডিয়ার অস্থিময় কাঁধের ওপর একটা মৃদু চাপড় দেয়।

জনতা হো-হো ক'রে হেসে ওঠে। আকাশ ফাটিয়ে ফেলা হাসি। হঠাৎ কানে এলে সত্যি ভয় হয়।

এই জনতার ভেতর থেকে অত্যন্ত খর্ব্বাকৃতি ম্যাগ্‌নাফেভের সরু ঘাড়টা ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো। নিজের ডানহাতের তর্জ্জনী বাঁ-হাতের তর্জ্জনী দিয়ে আবেষ্টন ক'রে এক অদ্ভুত মুখভঙ্গি ক'রে ব'ল্লে : ক্যা—ক্যা—ক্যা—ক্যান্‌ডিয়া—সি—সি—সিনিগিয়া।

কিন্তু এই, শেষ নয়। এখানে য'দি ও ক্ষান্ত হতো, তা' হ'লে না হয় একটা কথা ছিলো। নানা রকম নিম্নস্তরের ঠাট্টা-তামাসা, নানা রকম অঙ্গভঙ্গি ও লাগলো ক'রতে। এবং সেই ঠাট্টা-তামাসা, অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গিমা—সমস্তই ক্যান্‌ডিয়া ও সিনিগিয়াকে উপলক্ষ্য ক'রে। ক্যান্‌ডিয়ার যে সিনিগিয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্র আছে—এইটাই সে সকলকে বোঝাবার কী অক্লান্ত প্রচেষ্টাই না করে। দর্শকরা কিন্তু এটা বেশ উপভোগ ক'রতে লাগলো। ওরা হাসে—প্রাণ খোলা হাসি হাসে।

কিন্তু ক্যান্‌ডিয়া? সে শূন্য কাচের গ্লাসটা হাতে ধ'রে বিহ্বল

হ'য়ে আছে। প্রথমটা ও এসব তামাসার তাৎপর্য্য বুঝতে পারে না।

আকাশের বুকে যেমন সহসা বিদ্যুৎরেখা দেখা যায়, ঠিক তেমনি সহসাই ক্যান্‌ডিয়া একসময়ে এসবের অর্থ পারে বুঝতে।:—এরা তার নির্দ্দোষিতায় করেনা বিশ্বাস। নিজেকে আর একটা নতুন বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে সে সিনিগিয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে চামচেটা বের ক'রে দিয়েছে।:—

মুহূর্ত্তের মধ্যে ক্যান্‌ডিয়ার সর্ব্বশরীরে ক্রোধের একটা সীমাহীন চাঞ্চল্য প্রকাশ হ'য়ে পড়লো! এবং এরই প্রভাবে ওর ঐ শীর্ণ কুব্জদেহ অকস্মাৎ যেনো বলিষ্ঠ যুবার মতোই শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠলো। চক্ষের পলক পড়বারও সময় রইলো না। ক্যান্‌ডিয়া লক্ষ্য ক'রেই ম্যাগ্‌নাফেভের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। চুলের মুঠি ধ'রে ওকে টেনে নিয়ে এলো। নিয়ে এসে, এক অপূর্ব্ব শক্তিতে তাকে বন্-বন্ ক'রে গাড়ীর চাকার মতো বারকয়েক ঘুরিয়ে দিলে ছেড়ে। লোকটা ঘুরতে ঘুরতে খানিকটা তফাতে গিয়ে পড়ে। সামলিয়ে নিয়ে, পালাবার উপক্রম ক'রতেই, ক্যান্‌ডিয়া এবার ওর মুখের ওপরই আছাড় খেয়ে প'ড়ে খিমচিয়ে, ঘুসি মেরে ওর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিল।

*   *   *   *   *   *

নিজের মাথা গোঁজবার আশ্রয়ে ফিরে এসে ক্যান্‌ডিয়া টল্‌তে টল্‌তে বিছানায় শুয়ে পড়লো। অন্তরের সীমাহীন যাতনায়, সে এবার ছোটো মেয়ের মতো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো:—হায়রে!

কী উপায়ে সে নিজেকে এই মিথ্যে কলঙ্ক থেকে মুক্ত ক'রতে পারবে? কী ক'রে সে লোককে বিশ্বাস করাবে—সে একেবারে নির্দ্দোষ, ফুলের মতোই কলঙ্কহীন? না-না, চুরি সে করেনি। যাদুকরের সঙ্গে আপোষে মিট-মাট ক'রে চামচে বার ক'রে দেয়নি। কোথায় পাবেও চামচে? চামচে যে সে নেয়নি। যাদুকরের সঙ্গে আপোষ, তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে চুরির জিনিষ ফিরিয়ে দেওয়া—এই অপবাদটা এখন আরো যেনো বেশী ক'রে ওর মনে কষ্ট দিতে সুরু ক'রলো। ক্যান্‌ডিয়া কাঁদে। অবিরাম তার চোখ দিয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

শুয়ে শুয়ে ক্যান্‌ডিয়া ভাবে,—তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণের তিনটে, চারটে, পাঁচটা আলাদা-আলাদা যুক্তি। এই যুক্তি দিয়ে সে প্রমাণ ক'রবে, চামচেটা উঠোনের গর্ত্তের মধ্যে পাওয়া যায়নি, না কখনোই পাওয়া যায়নি।

ক্যানডিয়া বেরিয়ে আসে। চারিদিকে ঘুরে লোক ডেকে-ডেকে তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ক'রতে নানা রকম যুক্তি দেখায়। কিন্তু তারা হাসে। মনে-মনে হাসে।

ক্যান্‌ডিয়া ওদের মনের ভাব বুঝতে পারে। একটুও দেরী হয় না বুঝতে। ও যায় রেগে। তার সমস্তই নতুন যুক্তি তবে নিষ্ফল হলো?

ক্যান্‌ডিয়া আবার যায় নিজের আশ্রয়ে ফিরে। সারা রাত্রি ধ'রে চিন্তা করে, নানা রকম নতুন-নতুন যুক্তি। সকালে বেরিয়ে আসে লোক ডেকে পূর্ব্বদিনের মতো তাদের যুক্তি দেখিয়ে বোঝাবার চেষ্টা

করে। যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, সে নির্দ্দোষ। চামচে সে করেনি চুরি। যাদুকরের সাথে তার কোনো ষড়যন্ত্র ছিলো না। লোকে শোনে। শুনে হাসে। কেউ বিশ্বাস করে না।

কিন্তু এর একটা বিষময় ফল দেখা গেলো। সদাসর্ব্বদা এই চিন্তাকে আশ্রয় ক'রে থাকার জন্যে, ক্যান্‌ডিয়ার মনের সত্যিকারের মানুষটি গেলো কোথায় তোলিয়ে। চামচে—রূপোর চামচে ছাড়া এ-বিশ্বে তার আর দ্বিতীয় চিন্তা নেই। চামচে—চামচেই এখন ওর জপমালা। রূপোর চামচেই এখন ওর সাধনা।

ক্যান্‌ডিয়ার নিজের কাজে আর মন বসতে চায় না। কখনো হয়তো লোহার সেতুটার নীচে খরস্রোতা নদীর তীরে গিয়ে ও কাপড় কাচে। অন্যমনস্কে কাচতে কাচতে তার হাত ফস্কে হয়তো কাপড় নদীর স্রোতে ভেসে তার নাগালের বাইরে চলে যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য! ওর তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। আরো যে-সব ধোপানী নদীর ঘাটে কাপড় কাচে, তাদের কানের কাছে ও অনর্গল ব'কে যায়। ব'কে যায়, সেই একটি মাত্র বিষয়কেই কেন্দ্র ক'রে। ধোপানীরা কেউ ওর সেই পুরোণো ইতিহাস শোনে না। কেউ হয়তো আবার গান গেয়ে, ঠাট্টা-তামাসার ভেতর দিয়ে তার কথার জবাব দেয়। শুনে ক্যান্‌ডিয়া হঠাৎ অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি ক'রে ঠিক্ উন্মাদিনীর মতো একটা বিকট চীৎকার ক'রে ওঠে।

এমনি ক'রে দিনের পর দিন যায় চ'লে। ক্যান্‌ডিয়ার কাজ

ক'রতে ভালো লাগেনা। কেউ ওকে আর কাজও দেয় না। আগেকার দু'-চার জন মনিব দয়া ক'রে কোনো কোনো দিন তার অন্নটা পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু প্রতিদিন তাকে খাওয়াবে কে? ক্যান্‌ডিয়া আবার কাজ দিলে ছেড়ে। পেটের জন্যে তাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ক'রতে হলো। গায়ে একটা সামান্য আচ্ছাদন দিয়ে, তাকে পথে-পথে ভিক্ষে ক'রতে দেখা যায়। পথের দুষ্টু ছেলেরা ওর পেছু নেয়। বলে: ক্যান্‌ডিয়া, ও ক্যান্‌ডিয়া! আমাদের সেই চামচের ইতিহাসটা একবার শোনাও তো!

ক্যান্‌ডিয়া পথ চলতে থাকে। পথচারীদের থামিয়ে দাঁড় করায়। দাঁড় করিয়ে তার কাহিনী ব'লে যায়। বলা শেষ হ'লে, নিজেকে রক্ষে করবার জন্যে কতো অর্থহীন যুক্তিই-না দেখায়। বড়োরা কোনো কোনো সময়ে তাকে স্বেচ্ছায় ডাকে। ওর কাহিনী শোনে—দু'-বার, তিন-বার, চারবার। শুনে তারা ক্যান্‌ডিয়াকে পয়সা দেয়। কেউ বা তার কাহিনী চুপ ক'রে শুনে, শেষে তাকেই মর্ম্মে-মর্ম্মে আঘাত করে। ক্যান্‌ডিয়া এবার একটা কথাও বলে না। শুধু মাথা নেড়ে অন্য পথ ধরে।

ক্যান্‌ডিয়াকে দেখা যায়—তার ভিক্ষুনী-সঙ্গর মধ্যে। এখানে সে সেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করে। নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করবার জন্তে অবিরাম অক্লান্ত চিত্তে যুক্তি দেখায়।

* * * * * *

আঠারোশো চুয়াত্তর সাল—শীতকাল।

ক্যান্‌ডিয়ার শেষ-পরিণতি

ক্যান্‌ডিয়া মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। তাকে এই দুঃসময়ে দেখাশোনা ক'রছে, তারই এক ভিক্ষুনী বোবা বান্ধবী।

মৃত্যু-শয্যায় থেকে মাঝে-মাঝে ক্যান্‌ডিয়া বিকার-ঘোরে হাতের কনুইয়ের ওপর ভর ক'রে উঠে বসবার চেষ্টা করে। নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করবার জন্যে পূর্ব্বের মতো যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। মুখ দিয়ে একটা কথাও ফোটেনা ওর। শুধু চক্ষু দু'টি অন্তর্যাতনায় অশ্রুময় হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু ক্যান্‌ডিয়ার কোটরে প্রবিষ্ট সেই চক্ষু দু'টি, নিঃশব্দ অশ্রুপাতের মধ্যে দিয়ে, যেনো অনন্ত ব্যাকুলতায় ব'ল্‌তে চায় :—

আমি নিইনি—আমি নিইনি।

দু'টি নর ও একটি নারী

মার্চ্চমাসের তেইশ তারিখ। সূর্য্য আকাশের পশ্চিমদিকের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। এর ভেতর থেকে যে-রশ্মিটুকু বেরিয়ে আসছে, তার সৌন্দর্য্য সত্যিই উপভোগ করার মতো।

এমনি যখন প্রাকৃতিক অবস্থা, তখন জেলখানার লোহার দরজা ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে খুলে যায়। এর মধ্যে প্রবেশ করে, একটি কয়েদী। বয়েস তার কম, সত্যিই কম। চাল-চলন, হাব-ভাব, চেহারা—সবই অন্য কয়েদী থেকে বিভিন্ন। দেহটা ঘিরে—শাদা পোষাক। মাথার ওপর লম্বা টুপি। সেটার রঙও শাদা—দুধের মতোই শাদা। টুপিটার একপ্রান্তে একটা রেশমী ফিতে। এই ফিতেটাও দেখতে শাদা রঙের।

সমস্ত পথটা সে নীরবে এসেছে। কারুর সঙ্গে একটাও কথা কয়নি। পুলিশ ওকে হাতকড়া দিয়ে ট্রেণে ক'রে আনছিলো। কামরায় সে পাষাণের মতো স্তব্ধ হয়ে, মুখ নীচু ক'রে শুধু নিজের হাতের নখ গুলির দিকে চেয়ে ছিলো ব'সে। তারপর এখানে নেমে, সে জেলখানার পরিচালকের মুখের দিকে, আগ্রহের সঙ্গে তাকালো।

দু'টি নর ও একটি নারী

কিন্তু জেল-পরিচালক তার এই দৃষ্টির বিনিময়ে, ওর মুখের ওপর যে-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলেন, তা' উদাসীনতায় ভরা।।

কিন্তু একটা মজার ব্যাপার দেখুন! কয়েদী এবং জেল-পরিচালকের নাম একই। দু'-জনেই ক্যাসিওলঙ্গিনো। এটা ওরা জানে। হ্যাঁ জানে। নিশ্চয়ই জানে।

জেল-পরিচালক মানুষটি বেঁটে। সামনের দিকে সামান্য নুয়ে পড়েছেন। ছোটো ছোটো হাত দু'টি প্রায়ই ওঁর ওভারকোটের পকেটের মধ্যে ঢোকানো থাকে। মুখখানি পরিষ্কার ক'রে কামানো। মুখে একটা ক্লান্তির ভাব। চোখ দু'টি সবুজ এবং বুদ্ধির পরিচায়ক। মাথার চুল ছোটো ছোটো ক'রে ছাঁটা। কান দু'টি বেশ বড়ো বড়ো—সহজেই লোকের নজরে পড়ে।

এপ্রিলের প্রথমেই, মানে একেবারে পয়লা তারিখে, ক্যাসিও আবেদন ক'রেছিলো। আবেদন করেছিলো জেল-পরিচালকের কাছে। উদ্দেশ্য—লেখবার অনুমতি পাওয়া।

সেই জন্যে ক্যাসিওকে ডেকে পাঠানো হয়েছে জেল-পরিচালকের নিজের ঘরে।

ক্যাসিও একটা বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দেখছে—বাইরের সেই পড়ন্ত সূর্য্য-কিরণের সোনালী আভা। জেলের পরিচালক একটা শাদা রঙের টেবিলের সুমুখে অস্বাভাবিক

ভাবে ঝুঁকে প'ড়ে নিজের কাজ ক'রে যাচ্ছেন। ক্যাসিও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ওর সামনে দাঁড়িয়ে যে অপেক্ষা ক'রছে, সে দিকে ওঁর ভ্রূক্ষেপ নেই।

এক সময়ে হঠাৎ জেল-পরিচালক ক্যাসিওর দিকে ফিরলেন। কিন্তু নিজের আসন ত্যাগ ক'রে তাকে সম্মান দেখাতে উঠলেন না। ব'সতেও ব'ল্লেন না। ওর মুখের দিকে একবার চেয়েই, তখুনি দৃষ্টি নিলেন ফিরিয়ে। ব'ল্লেন, জাল করার অপরাধে, তোমার তিন বছর বিনাশ্রম কারাবাসেব আদেশ হয়েছে। একটু চুপ ক'রে থেকে সেই ভাবেই চেয়ে ব'ল্লেন, হ্যাঁ একবার—মাসে একবার ক'রে চিঠি লেখার অনুমতি তোমাকে দেওয়া গেলো।

—কিন্তু আমি তো বাড়ীতে চিঠি লেখবার জন্যে অনুমতি ভিক্ষে ক'রিনি। আমার নিজের মন ভালো রাখবার জন্যে—ঘরে, আমার ঘরে ব'সে এটা-সেটা লেখবার অনুমতি আপনার কাছে............

জেল-পরিচালক বাধা দিয়ে ব'ল্লেন :—

—জেলের নিয়ম তা' নয়। তবে, তুমি যদি ক্যারানীদের আপিসে সকলের সামনে ব'সে জেলের খাতাপত্তর লিখতে চাও, তার ব্যবস্থা আমি ক'রে দিতে পারি। কেমন—রাজী?

ক্যাসিও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

কিন্তু একটা কথা আছে। জেল-পরিচালক ২৪৫ নম্বরের আসামীর, মানে ক্যাসিওর সম্বন্ধে, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যে-রিপোর্ট পেয়েছিলেন,

তাতে উনি জানতে পেরেছেন যে, এই আসামীটি ভদ্রঘরের ছেলে। অবস্থা খুব ভালো। সার্ডেনিয়ার একজন বিখ্যাত বড়োলোক। এই জন্যে, জেল-পরিচালক ওর ওপর তেমন কঠোর হতে পারেন না। আর তা' ছাড়া, ২৪৫ নম্বরের আসামীর চোখ-মুখে এমন একটা আকর্ষণের ভাব আছে যে—জেল-পরিচালক শত চেষ্টা ক'রেও ওর বিরুদ্ধে, নিজের স্বভাবগত কঠোরতা নিয়োগ ক'রতে পারেন না হয় তো। এই নিয়ে ওদিকে আবার অন্যান্য কয়েদীরা, ক্যাসিওর বিরুদ্ধে একটা হিংসার ভাব, মনে-মনে পোষণ করে। ওরা বলাবলি করে—জেল-পরিচালক সার্ডেনিয়ার লোক। ক্যাসিও ও সেখানকার বাসিন্দে। দু'জনের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা আত্মীয়তা আছে। সেই জন্যে, তিনি এই আসামীকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখেন না। দেখেন স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে।

এমনি আরো কতো ওরা বলাবলি করে।

* * * * * *

ক্যাসিও ব'সে আছে জেলের আপিসের একখানা টেবিলের সামনে। টেবিলটার তিন দিকে আরো তিনটি কয়েদী। ক্যাসিও দেখলো, এরা কাজ ক'রতে পারে না ভালো ক'রে। চারিদিকে একটা বিশৃঙ্খলতার ছাপ। টেবিলটার ওপর ছড়ানো কাগজ-পত্তর, খাতা, মাঝে-মাঝে যাচ্ছে বাতাসে উড়ে ঘরের এদিক-ওদিক। ওরা কেউ করে না ভ্রূক্ষেপ। ঘরের মধ্যে এখানে-ওখানে জঞ্জাল আছে জমা হয়ে। অপরিষ্কার—অত্যন্ত অপরিষ্কার। দেখে-শুনে ক্যাসিওর মনটা, বিরক্তি এবং অসন্তোষে ভরে ওঠে।

কিন্তু শুধু এই নয়।

ক্যাসিওর সঙ্গ ওরা পছন্দ করে না। ওরা ওকে নিজেদের সামনে বসতে দেখলেই, মুখচোখের ভাব এমনি বিশ্রী ক'রে তোলে যে, ক্যাসিও তা' দেখে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এদের সঙ্গ ওর ভালো লাগেনা। ওর মনে হয়—এর চেয়ে তার নির্জ্জন ছোটো ঘর খানির মধ্যে একা থাকা—অনেক ভালো। সেখানকার জানালাটার গরাদে হাত রেখে বাইরের পর্ব্বতশ্রেণীর সৌন্দর্য্য, তার চোখে পড়বে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে—ওর নিজের দেশের প্রকৃতির রূপ। এতে সে, তার এই দুর্ভাগ্যের মধ্যেও, শান্তি পাবে।

দিন কয়েক পরে:—

খামের ওপর সার্ডেনিয়ার ছাপ্ নিয়ে ক্যাসিওর নামে একখানা চিঠি এলো। খামের শিরোনামা বেশ পরিষ্কার অক্ষরে লেখা। দেখলেই বোঝা যায়—নারীর হাতের লেখা।

কিন্তু চিঠি খুল্লেন জেল-পরিচালক। আগাগোড়া পাঠ করলেন একটা ইতস্ততার মধ্যে দিয়ে। তাঁর মনে হতে থাকে, এরই অপেক্ষায় সত্যিই বুঝি তিনি এতো দিন ব'সে ছিলেন।

জেলের পরিচালক হাজার হোক মানুষ—পুরুষ মানুষ। যৌবন যে সত্যি তাঁর দেহ থেকে বিদায় নিয়েছে, তা' নয়। উনি অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। সহানুভূতি এবং মমতা তাঁর হৃদয়ে আছে। ২৪৫ নম্বরের কয়েদী যদি গরীব হতো, শয়তান, দুষমন হ'তো,—যেমন

অন্য কয়েদীরা হয়—তাহ'লে পরিচালক কখনোই প্রথম দিনের পর থেকে তার সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্রভাব-ধারা মনে-মনে পোষণ করতেন না।

২৪৫নম্বরের কয়েদীর চিঠিখানিতে লেখা আছে :—

ক্যাসিও, ধৈর্য্য ধ'রে থাকো। হতাশ হ'য়ো না। তোমার এই পরিণতির জন্যে নিজের মনকে অযথা কষ্ট দিও না। স্মরণ রেখো, এ-পৃথিবীর বুকে আমরা একা। ভালোবাসা নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। এই ভালোবাসাকে অবলম্বন ক'রে, আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস ক'রি। ক্যাসিও, সেই বিশ্বাসের অন্ত নেই। সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। দুঃসময় যাবে কেটে। সময়ের অনুকূলতায়, ঈশ্বর যখন আমাদের দু'জনের মাঝে মিলনের সুমধুর-বাঁশী বাজাবেন, তখন, আমার জন্যে তোমার এই যে স্বার্থত্যাগ, তার আমি প্রতিদান দোবো। নিজেকে নীচ এবং ঘৃণিত ব'লে মনে ক'রো না। সাধুলোকেরা জানে,—তুমি আমার জন্যে যে-কাজ করেছো, এবং যে-কাজের ফলে তোমার এই দুঃখ, সে-কাজ বীরের কাজ। বীর না হ'লে এ-কাজ কারো সাহসে কুলোয় না।

চিঠি পড়ে জেল-পরিচালক চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন। সামান্য ক'টি লাইন লেখা। কিন্তু কী প্রেরণা, আর কী ভালোবাসার সৌরভ-ই না এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে। জেলখানায় এই রকম সুন্দর চিঠি, এই প্রথম। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তিনি ২৪৫ নম্বরের কয়েদীকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। সে এলে, তাকে আপিসের কাজের সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলবার

পর, ক্যাসিওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ব'ল্লেন, তোমার একখানা চিঠি আছে।

এই ব'লে তিনি ক্যাসিওর হাত লক্ষ্য ক'রে চিঠিখানা এগিয়ে দেন।

ক্যাসিও চিঠিখানা, মানে খোলা চিঠিখান', নতমুখে হাত বাড়িয়ে নিরুত্তরে গ্রহণ ক'রলো বটে, কিন্তু ওর সমস্ত মুখখানা একেবারে জবাফুলের মতো রাঙা হ'য়ে উঠলো। ওর নিজের নামের চিঠি জেলের পরিচালক খুলে পড়েছেন। এই সত্যিটা জেনেও সে চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। ব'লতে পারে না মুখ ফুটে যে, পরের চিঠি খুলে পড়া শুধু বেআইনী নয়, পাপও।

কিন্তু এই খোলা চিঠি পাওয়ার দিন থেকেই ক্যাসিওর ভাগ্য যেনো হঠাৎ সুপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে। জেলের পরিচালক হঠাৎ ওকে সুনজরে দেখতে সুরু করেন। কিন্তু পরিচালকের এই পক্ষপাতিত্ব, অন্যান্য কয়েদীর চোখ ও কাণকে এড়িয়ে যেতে পারে না। তারা এর জন্যে মনে-মনে অসন্তুষ্ট এবং ঈর্ষাপরায়ণ হ'য়ে ওঠে। তারা বলাবলি ক'রতে থাকে—ক্যাসিও জেল-পরিচালকের নিকট-আত্মীয়—তাই এই পক্ষপাতিত্ব! তবু, এ অন্যায়—বড়ো অন্যায়।

একমাসের পূর্ব্বে ক্যাসিও তার বৈমাত্রেয়ী ভগ্নি পোলার চিঠির জবাব দেবার অনুমতি জেল-পরিচালকের কাছ থেকে পেলে না।

দু'টি নর ও একটি নারী

তারপর একদিন ক্যাসিও লিখলো :—

এখানে আমি একমাসের ওপর হলো আছি। কিন্তু এই সময়টা আমার মনে হচ্ছে বিশ বছর। আমার পরিশ্রম অনেক কমে গিয়েছে। এঁরা আমাকে ক্যারানীর আপিসে কাজ দিয়েছেন। কাজ যদিও কম নয়, তবু এটা আমার সময় কাটাবার পক্ষে ভালো। প্রথমে এ কাজে আমার মন বসতো না। কিন্তু এখন সব সহ্য হ'য়ে গিয়েছে। জেল-পরিচালক মশাই, আমাকে বড়ো স্নেহ করেন। প্রীতির চক্ষে দেখেন। হয়তো ভালোও বাসেন যথেষ্ট। হ্যাঁ, আমি জানি—বেশ জানি যে, সময় কখনো ব'সে থাকে না। এর কাজ ক'রে এ যাবেই। কিন্তু তবুও আমার মনে হয়, আমার এই যে শাস্তিভোগ, এটা থাকবে অনন্তকাল ধ'রে। ন'শো সাতাশী দিন এখনো বাকী। সমুদ্রের ঢেউয়ের যেমন শেষ থাকে না, আমার বাকী দিনগুলিও মনে হয় সেই রকম সীমাহীন, সংখ্যাহীন। তোমার কথা যখন আমার মনে হয়, তখন আমি বড়ো অস্থির হয়ে উঠি। মনের ভেতরটা কেমন যেনো ব্যথায় টন্-টন্ ক'রে ওঠে। কিন্তু তবু আমি শান্তি পাই। পোলা তুমি কতো ভালো! আমার অনুরোধ, আমাকে তুমি ভুলে যেও না। আমার অনুপস্থিতির মধ্যেই তুমি বিয়ে ক'রে, ঘর-সংসার ক'রো। কিন্তু এ' কতোখানি তোমার পক্ষে অসম্ভব, তা' আমার অজানা নেই। আমি জানি,—সৎ-ভগ্নি কখনো তার দুঃখী ভাইকে ভুলতে পারে না। রাত্রে অল্প পরিসর বিছানায় আমার ঘুম আসে না। শয্যার ওপর ছট্‌ফট্ কর'তে থাকি। তখন আমার ভয় হয়,—বড়ো ভয় হয়।…কিন্তু তারা আমার

এ কী সর্ব্বনাশ ক'রলে?···চিঠিব উত্তর শীঘ্র দিও। আমায় ভুলো না, পোলা, আমায় ভুলো না।

*　　*　　*　　*　　*　　*

জেল-পরিচালকের মন ঈর্ষার এবং আকাঙ্ক্ষার একটা বিস্ময়কর মোহতে সমাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। সমাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে তখন, যখন পোলার আর একখানি চিঠি তার হাতে এসে পড়লো। পোলা ক্যাসিওকে চিঠির একস্থানে লিখেছে, ক্যাসিওকে নিরানন্দ থাকতে জেনে সে কতোখানি আন্তরিক দুঃখিত, ক্যাসিও ফিরে না আসা পর্য্যন্ত সে বিয়ে ক'রবে না, কিছুতেই না। জেল-পরিচালকের উদ্দেশেও চমৎকার কথা লিখেছে:—তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা ক'রো। তিনি তোমার জন্যে যথাসাধ্য ক'রেছেন। তোমাকে তিনি নিজের ছেলের মতো দেখেন। ঈশ্বরের কাছে আমি তোমার ও তাঁর মঙ্গল কামনা ক'রি।

তারপর একদিন এলো পোলার তৃতীয় পত্র। এতে সে লিখেছে:— তোমার অভাবে আমার সময় কাটছে নিরানন্দে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকবার চেষ্টা ক'রি। ভাবি, হয়তো এতে শান্তি পাবো। কিন্তু কৈ—তা' তো হয় না, শান্তি তো আমি পাইনে। শান্তি পাবার আশায় মাঝে-মাঝে আমার পালক পিতা-মাতার সঙ্গে আমি দেশে যাই। এই দেশ আমার এখন আনন্দের একমাত্র আশ্রয়। আমরা ঘোড়ায় করেই যাই। এটা কিন্তু বেশ লাগে। মনকে ভুলিয়ে রাখবার চমৎকার উপায়। বাড়ীতে নতুন কিছু ঘটেনি। ইস্কুলে যে বুটীদার কাপড় পর্দ্দা করবার জন্যে বুনেছিলাম, তার ওপর এখন সূচীকার্য্য ক'রছি।

আমি আর কারো দেখা পাইনে। দেখা করবার ইচ্ছেও হয়না। আমি সব সময়েই তোমার কথা ভেবে দিন গুনছি। :—

পত্রপাঠ সমাপ্ত ক'রে জেল-পরিচালক নিজের মনেই ব'লে ওঠেন, এ-জগতে যারা ধনী আর মহৎ, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করেনা কেন? আশ্চর্য্য—বড়োই আশ্চর্য্য!

এই ব'লে তিনি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। ঘরের পাশ দিয়ে যে বাগানটা চলে গিয়েছে বরাবর বহুদূর পর্য্যন্ত, সেই বাগানে এসে ধীরে ধীরে তিনি পায়চারি স্বরু করেন। গাছে-গাছে কতো শতশত গোলাপ ফুল ফুটে, চারিদিকে পাগল-করা সৌরভ দিচ্ছে ছড়িয়ে। জেল-পরিচালক চিন্তিত মনে পায়চারি ক'রতে ক'রতে ফুলের ঘ্রাণ নিতে থাকেন। নিমিষের মধ্যে তাঁর মন ছুটে যায় সেই ২৪৫ নম্বরের কয়েদীর ভগ্নির দিকে। কল্পনা-চক্ষে উনি নিরীক্ষণ করেন :—পোলা তার ভাইয়ের মতো স্থন্দর—দেখতে স্থন্দর। সমস্ত দেহভরে মাধুরী এবং লালিত্য যেনো ঠিকরে পড়ছে। এবং সেই অনন্যসাধারণ সৌন্দর্য্যের মাদকতায় জেল-পরিচালক আত্মহারা হ'য়ে তারই উদ্দেশে দু'-হাত, দু'-দিকে প্রসারিত ক'রে ছুটে চলেছেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাঁর মন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তাঁর নিজের ওপরই রাগ হয়। এ কী ছেলেমানুষী তিনি ক'রছেন?

*   *   *   *   *

আরো দু'-তিন মাসের মধ্যে পোলার তিন-চার খানা চিঠি এলো ক্যাসিওর নামে। শেষের চিঠিখানায় পোলা লিখেছে যে, সে তার

নিজের একখানি প্রতিকৃতি পাঠাতে পারে, যদি ক্যাসিও ওটা জেল-পরিচালকের কাছ থেকে পাবার অনুমতি পায়।

ক্যাসিও অনুমতি পেলো।

এক, দুই তিন, সপ্তাহ ধ'রে সেই দু'টি নর, একটি নারীর প্রতিকৃতির জন্যে কী ব্যাকুল ভাবেই না প্রতীক্ষা ক'রতে লাগলো! অন্ধ যেমন জগতের আলো দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে—ঠিক্ তেমনি।

কিন্তু সেই ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকলেও, দু'জনের প্রতীক্ষার ধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ক্যাসিওর প্রতীক্ষার মধ্যে ছিলো শান্ত-মধুর ভাব। কিন্তু জেল-পরিচালকের প্রতীক্ষা, একটা উগ্র মানসিক চঞ্চলতাকে অবলম্বন ক'রে, সাবানের ফেনার মতো ফেঁপে ফেঁপে উঠছিলো। তাঁর মনের শান্তি গেলো হারিয়ে, স্বস্তি গেলো কোথায় তলিয়ে!

অবশেষে একদিন পোলার চিঠি এবং প্রতিকৃতি এসে জেল-পরিচালকের হাতে পড়লো। পোলা লিখেছে :—

ছবিটা যখন তোলা হয়ে ছিলো, তখন আমি তোমার কথা ভেবে নিঃশব্দে হাসছিলাম। আশা ক'রি আমার এই ছোট্টো-ছবিটা, তোমার মনে নির্ম্মল-আনন্দের এবং শান্তির স্রোত বইয়ে দেবে। তোমার আগামী শুভদিনের জন্যে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রছি। আমার চোখের ভাষা তোমাকে কি ব'লতে চায়, আশা করি সেটা তোমার বুঝতে দেরী হবে না।

জেল-পরিচালক প্রতিকৃতির চক্ষু দু'টির প্রতি অন্তরের সমস্ত দৃষ্টি

শুস্ত করেন। কিছুক্ষণ পরে চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে যান। প'ড়ে আবার প্রতিকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর মুখ থেকে অজ্ঞাতে বেরিয়ে আসে :—এমনি চমৎকার চিঠি তিনি ভাইকে লিখতে পারেন? কিন্তু,—কিন্তু আরো কতো সুন্দর চিঠি লিখতে পারবেন, তাঁর ভালোবাসার পাত্রকে!

এই কথা তাঁর কানে এসে যখন বাজলো, তখন জেল-পরিচালকের মন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো। তাঁর দুঃখও হ'লো এই চিন্তা ক'রে যে, তিনি কুৎসিত ও বিগত-যৌবন। এবং তাঁকে, তাঁর ঐ চক্ষু দু'টিকে, এখানকার সমস্ত কয়েদীই ঘৃণা করে, ভয় করে!

জেল-পরিচালকের চোখ দু'টি সহসা সজল হ'য়ে উঠলো। তিনি আর একবার ছবিটার দিকে বহুক্ষণ ধ'রে একদৃষ্টিতে রইলেন চেয়ে। এবং এর ফল এই হলো যে, তিনি ছবি এবং চিঠি—কোনোটাই ক্যাসিওকে দিলেন না। সত্যিটা অম্লান-বদনে গোপন ক'রে রাখলেন।

* * * * *

সেই রাত্রে জেল-পরিচালক স্বপ্ন দেখেন। অসাধারণ স্বপ্ন :—জেল-কয়েদীরা একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেছে। লৌহশৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলে তাঁর দিকেই রুদ্র-মূর্ত্তিতে আসছে এগিয়ে। তিনি পোলার প্রতিকৃতি ধ'রে আছেন। তাঁর হাত কাঁপছে থর-থর ক'রে। পালাতে পারেন না, নিজেকে রক্ষা ক'রতেও পারছেন না। হঠাৎ ছবিখানি তাঁর হাত থেকে মাটিতে টুক্ ক'রে পড়ে যেতেই ২৪৫ নম্বর জানতে পারলে—এই ছবিখানি তিনি আত্মসাৎ ক'রেছিলেন। কিন্তু কয়েদীরা যেমনি তাঁকে হত্যা ক'রতে উপক্রম ক'রেছে, ক্যাসিও তাদের মধ্যে

ঝাঁপিয়ে প'ড়লো। ব'ল্লো, ছেড়ে দাও, ওঁকে ছেড়ে দাও। উনি আমার ভগ্নিকে বিয়ে ক'রবেন।

ঘুম ভেঙে যেতেই জেল-পরিচালক উপলব্ধি ক'রলেন, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠেছে। বাকী রাত্রিটা তিনি শয্যার ওপর ছট্‌-ফট্‌ ক'রে কাটিয়ে দিলেন।

* * * * * *

ক্যাসিও দিনের পর দিন পোলার চিঠি আর প্রতিকৃতির পথ চেয়ে আছে বসে। এক সপ্তাহ্‌ কেটে গেলো। ক্যাসিও অস্থির হয়ে উঠলো। ওর দুশ্চিন্তায় মন গেলো পূর্ণ হয়ে। তাইতো! কোনো সংবাদ নেই! পোলা অসুস্থ হয়ে পড়লোনা তো? মনে মনে স্থির ক'রলো—টেলিগ্রাম ক'রবে। জেল-পরিচালককে এই কথাটা জানালেও তিনি অনুমতি দিলেন না। কিন্তু বহু সাধ্যসাধনা এবং অনুনয় বিনয়ের পর তার নির্দ্দিষ্ট মাসের মাত্র দু'দিন পূর্ব্বে পোলাকে পত্র লেখবার পুনরাদেশ লাভ ক'রলো।

ক্যাসিওর এবারকার পত্র এমনি একটা ব্যথার সুরে লেখা যে, পাঠ ক'রে জেল-পরিচালকের মন বেদনায় টন্‌-টন্‌ ক'রে উঠলো। নিজের কুকান্তির জন্যে তাঁর লজ্জা ও অনুশোচনার অন্ত রইলো না। মানুষ নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে, কেমন ভাবে পাপের পথে নেমে যায়— সে কথা বুঝতে আজ তাঁর বাকী থাকে না। কিন্তু বুঝেও তিনি নিজের মনকে শাসন ক'রতে পারলেন না। তাঁর মনের এখন এমনি অবস্থা যে, ইচ্ছে হ'তে লাগলো দৌড়িয়ে গিয়ে ক্যাসিওর হাত দু'টি চেপে ধ'রে বলেন, ভাই ক্যাসিও, আমি নির্ব্বোধ হ'তে পারি। কিন্তু

দু'টি নর ও একটি নারী

তোমার ভগ্নিকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছি, যদিও তাঁকে আমি কখনো চোখে দেখিনি। তাঁকে দেবে—আমার স্ত্রী হ'তে ?

* * * * * * *

পোলা ক্যাসিওর পত্রের উত্তরে টেলিগ্রাম ক'রলো। ক'রলো ক্যাসিওকেই। এতে জানিয়েছে—একখানি প্রতিকৃতি সে পাঠাচ্ছে। এতো দিন পাঠাতে পারেনি এই জন্যে যে, তার ছবি তোলাতে কিছুতেই সময় হয়ে উঠছিলো না। অনিবার্য্য কারণ-বশতঃ তার চিঠি দিতে এতো দেরী হলো। এর জন্যে ক্যাসিও যেনো দুঃখ না করে।

এই মিথ্যে কথা লেখার মধ্যে একটা সাধু উদ্দেশ্য পোলার ছিলো। বেচারা ক্যাসিওর মনে নতুন ক'রে দুঃখ দিতে সে চায়নি। পোলা বুঝতে পেরে ছিলো, কেউ তার ছবি এবং চিঠি দু'-ই আত্মসাৎ ক'রেছে। কিন্তু পাছে সে সন্দেহ করে জেল-পরিচালককে, সেই জন্যে পোলা দোষটা নিলে নিজের ওপরেই।

* * * * *

একদিন জেল-পরিচালক ক্যাসিওকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। ক্যাসিও কিছুক্ষণ পরে তাঁর সুমুখে এসে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়ালো। কাজের সম্বন্ধে এ-কথা সে-কথা জিজ্ঞাসা করবার পর, তিনি হঠাৎ প্রশ্ন ক'রলেন, তুমি ক্ষমা প্রার্থনা ক'রেছো ?

—হ্যাঁ, ক'রেছি।

—কার কাছে ক'রেছো ?

জেল-পরিচালক কাজের মধ্যে চক্ষু নিবদ্ধ ক'রেই প্রশ্ন ক'রলেন। ওর দিকে ফিরে চাইলেন না।

—মন্ত্রীদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রেছি।

—তোমার দুর্ভাগ্য! ওঁদের কাছে দরখাস্ত পেশ ক'রলে কোনো কাজই হবে না। প্রায় দেখা যায়, ওঁরা এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। কয়েদীর নির্দ্দিষ্ট জেলভোগের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়—তারা মুক্তি পেয়ে যে-যার ঘরে ফিরে যায়, কিন্তু তবু ওঁদের কোনো জবাবই এসে পৌছয় না। অদ্ভুত, সত্যিই তাঁরা অদ্ভুত।

এই ব'লে জেল-পরিচালক এক মুহূর্ত্ত নীরব হয়ে থেকে পুনরায় ব'ল্লেন, রাণীর কাছে তোমার দরখাস্ত পেশ করো। উত্তর শীগ্যির পাওয়া যাবে।

—ক্ষমা করুন মশাই। আমি এ-কথা আগে জানতাম না। কিন্তু তাঁকে জানালে কি আমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে।

—যদি তোমার ভগ্নির তরফ থেকে, তোমার জন্যে অনুরোধ করা হয়, তবে নিঃসন্দেহে তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে।

এই ব'লে জেল-পরিচালক ক্যাসিওর দিকে, পেছন ক'রে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

যথাসময়েই ক্যাসিও পোলাকে লিখে জেল-পরিচালকের উদ্দেশ্য এবং শুভেচ্ছা জানালে।

* * * * *

শীতঋতু চলে গেলো। ফেব্রুয়ারী মাসের এক স্বচ্ছ প্রভাতে ক্যাসিও তার ঝাঁঝ্‌রি-সম্বলিত বাতায়নের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখ শুষ্ক—রক্তহীন। কিন্তু চোখ দু'টি আশায় প্রদ্দীপ্ত। তার

সর্ব্বশরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলি ভবিষ্যতের আনন্দের প্রত্যাশায় যেনো নেচে উঠতে থাকে।

কিন্তু দিন এসে প'ড়লো। মন্ত্রীমণ্ডলী ক্যাসিওলঙ্গিনো ইসিডোরোর স্বভাব সম্বন্ধে বিশদ-বিবরণ জেল-পরিচালকের কাছ থেকে চেয়ে পাঠালেন। জেল-পরিচালক যা' রিপোর্ট পাঠালেন তার সার মর্ম্ম হলো এই যে, ২৪৫ নম্বরের কয়েদী জাল করার আসামী কখনো হ'তে পারে না। তার মতো সৎ, সুশিক্ষিত এবং সুনীতি-সম্পন্ন যুবক কোথাও দেখা যায় না।

ক্যাসিওলঙ্গিনোর মুক্তির আদেশ এলো।

*   *   *   *   *   *   *

জেল-পরিচালকের খাশ কামরা। উনি টেবিলের সম্মুখে একটা আসন গ্রহণ ক'রে ক্যাসিওর প্রতীক্ষা ক'রছিলেন। উনি ওকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

যথাসময়েই ক্যাসিও ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ ক'রলো। কিন্তু এইবার বোধকরি সর্ব্বপ্রথম জেল-পরিচালক দাঁড়িয়ে উঠে ওকে সম্মান প্রদর্শন ক'রলেন। যুবকটির দৃষ্টি এটা এড়িয়ে গেলো না। ওর জিব কথা বলবার জন্মে দু'-চারবার ভেতর দিকে নড়ে উঠলো। কিন্তু শতচেষ্টা ক'রেও মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না। সে বেশ উপলব্ধি ক'রতে লাগলো, তার অন্তঃকরণ স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে।

জেল-পরিচালক হাতে একটা কাগজ ধ'রে ব'ল্লেন, মুক্তির আদেশ-পত্র এসেছে।

—মুক্তির আদেশ-পত্র ?

—হ্যাঁ, মুক্তির আদেশ-পত্র। ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে।

—কার জন্যে ? ক্যাসিও প্রশ্ন ক'রলো।

এই প্রশ্নে মনে হলো জেল-পরিচালকের বুঝি ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। কিন্তু নিজেকে সংবরণ ক'রে নিয়ে ব'ল্লেন, তোমার জন্যে—আবার কার জন্যে ?

ক্যাসিও সহসা যেনো তোৎলা হ'য়ে যায়।:—আ—আমার ? আমার জন্যে ? আ—আমার জন্যে ? ক—ক—কতো দিনের জন্যে ? কতো দিনের জন্যে ?

জেল-পরিচালক ব'ল্লেন, চিরদিনের মতো—তুমি চিরদিনের মতো মুক্তি পাবে। কিন্তু এখুনি, এই মুহূর্ত্তে নয়। এক সপ্তাহ—এক সপ্তাহ পরে তোমার মুক্তি—চিরদিনের মতো, বিনাসর্ত্তে খালাশ। বুঝেছো—চিরদিনের মতো।

* * * * * *

এই মুক্তিবাণী শুনে ক্যাসিও ধীরে ধীরে ওঁর নিকটবর্ত্তী হয়ে চোখতুলে উজ্জ্বল এবং কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে বহুক্ষণ চেয়ে রইলো। এবং দেখলো, বেশ ভালো ক'রেই দেখলো—ওঁর সেই পাণ্ডুর মুখখানি হঠাৎ কিসের সংস্পর্শে রক্তরাঙা হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যে।

তিনি ওকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ব'সতে অনুরোধ

জানালেন। মুক্তির আদেশ-পত্র দেখিয়ে ব'ল্লেন, দেখো, তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে। ভালো ক'রে শোনো। হঠাৎ আমাকে বিচার ক'রো না। এই সময় টুকুর জন্যে আমি অনেক দিন থেকে ব্যগ্র হ'য়ে অপেক্ষা ক'রছিলাম।

এই ব'লে জেলের পরিচালক নিঃশব্দে একটুখানি হাসলেন। কিন্তু সেই হাসির মধ্যে আনন্দ মাত্রও নেই।

তিনি গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে ব'ল্লেন, কি ভাবে নিজেকে তোমার কাছে প্রকাশ ক'রলে তুমি আমাকে ঠিক্ বুঝতে পারবে, তা' জানিনে। কিন্তু তোমার বুদ্ধির ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।

এই পর্য্যন্ত ব'লে তিনি ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বাইরের খোলা মাঠের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর সহসা একসময় দৃষ্টি ফিরিয়ে ক্যাসিওর মুখের দিকে চাইলেন। হাতের কাগজখানা দেখিয়ে ব'ল্লেন, তোমার মুক্তির আদেশ-পত্র পাবার জন্যে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রেছি। আমি জানি, আমার সেই অক্লান্ত চেষ্টা যোগ্যব্যক্তির জন্যেই। এজন্যে অবশ্য আমি কৃতজ্ঞতাভাজন হ'তে চাইনে। তোমার সঙ্গে আমি সম্মানের সঙ্গে কথা ব'লতে চাই। এখন তুমি মুক্ত। এখন তুমি স্বাধীন। এই স্বাধীনতা নিয়ে তুমি যা' ইচ্ছে তাই ক'রতে পারো।

ক্যাসিওর মন সন্দেহ এবং কৌতূহলের দোল্‌নায় দোল্ খেতে সুরু করে। কিন্তু আত্মসংবরণ ক'রে নম্রস্বরে বলে, ব'লুন, আপনার যা' বলবার আছে। আমার যথাসাধ্য আপনার জন্যে......

—কিন্তু আমি তো জানিনে,—সেটা তোমার সাধ্যে কুলোবে কি না!

—ব'লুন, আপনি ব'লুন। সঙ্কোচ ক'রবেন না, আপনি কোনো দ্বিধা ক'রবেন না।

—তবে শোনো। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না। উন্মাদ ব'লে উপহাস ক'রো না। তোমার ভগ্নির চিঠি পড়বার সময় তাঁর পরিচয় পেয়ে, তাঁকে আমি প্রীতির চক্ষে দেখেছি—তাঁকে আমি ভালো বেসেছি। হেসো না। আমি এখনো যুবক—আমার এখনো যৌবন আছে। ক্যাসিও, এখনো আমি বৃদ্ধ হইনি।

শুনে ক্যাসিওর মনে হলো, তার পায়ের তলায় পৃথিবীটা কেঁপে উঠেছে। মাথা উঠলো ঘুরে। চোখ চেয়েও যেনো কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সব ধোঁয়া—ধোঁয়া সপিল গতিতে উর্দ্ধে যাচ্ছে উঠে।

কিন্তু সংবরণ ক'রতে হলো নিজেকে। ধরা গলায় ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন ক'রলো:—তাকে আপনি চিঠি লিখেছিলেন?

—না-না, কখনো না! চিঠি তাঁকে আমি লিখিনি—নিশ্চয়ই লিখি নি। এতোটা সুবিধে নিতে আমি সাহস ক'রিনি।

—কিন্তু এযে অসম্ভব!

—অসম্ভব মনে হ'লেও এটা সত্যি! এবং যদিও এটা অদ্ভুত, তবু এটা ঠিক যে, এমনি ঘটনা এই প্রথম ঘটছে না। আমার—ক্যাসিওলঙ্গিনো—আমার দাবী, আমার প্রার্থনা সামান্য নয়। তোমার ভগ্নি সেটা কি অনুমোদন ক'রবেন?

—দাবী? কি দাবী? কি প্রার্থনা? রুদ্ধকণ্ঠে ক্যাসিও প্রশ্ন ক'রলো।

দু'টি নর ও একটি নারী

জেল-পরিচালক মিনিটখানেক নির্ব্বাক থেকে ব'ল্লেন, বিয়ের প্রস্তাব! এই আমার দাবী, এই আমার প্রার্থনা।

*   *   *   *   *   *

ক্যাসিও হঠাৎ এ-কথার উত্তর দিতে পারে না। অতিকষ্টে নিজেকে সংবরণ করে। সে ফিরে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ পরিচালকের মুখ-পানে নির্নিমেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এবং তাঁর সৌন্দর্যহীন, লালিত্যহীন বিশ্রী মুখকৃতি ওর চোখ দু'টিকে নিরতিশয় ব্যথিত ক'রে তোলে। সেই সীমাহীন অন্তর্যাতনার মধ্যেও সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। :—পোলা কখনো এই ব্যক্তির প্রস্তাব গ্রাহ্য ক'রবে না—ক'রতে পারে না।

ক্যাসিও জিজ্ঞাসা ক'রলো, কিন্তু আপনি কী ক'রছেন, সেটা কী একবার মনে ভেবে দেখেছেন? আমার দেশের সম্বন্ধে লিখে কিছু সংবাদ নিয়েছেন কি? এ-রকম ক্ষেত্রে······

—না আমি লিখিনি। কোনো খোঁজ-খবরও নিইনি। নিয়ে ফল কি হতো? আমি ভালো ক'রেই জানি, তোমার ভগ্নি সৎ। এর চেয়ে আর কিছু আশা ক'রিনে। আমি নিজেই তো এ-পৃথিবীতে একা—সম্পূর্ণ একা।

—আপনার মহত্ত্বের তুলনা মেলে না। আপনাকে কী ব'লে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো, তা' ঠিক ক'রে উঠতে পারছিনে। আপনাকে আমি ভুল বুঝিনি। আপনাকে আন্তরিক প্রশংসা ক'রি। আপনি

হতাশ হবেন না। আপনার কাছে আমি চির-ঋণী। আপনার উপকার ক'রতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা ক'রবো।

ক্যাসিওর এই কথাগুলি জেল-পরিচালকের কানে যেনো মধুরবর্ষণ করে। তাঁর মনের গভীরতম স্থানে, একটা উজ্জ্বল আশার রেখা সঞ্চিত হ'য়ে চোখ দু'টিকে অস্বাভাবিক জ্যোতিতে পূর্ণ ক'রে তোলে। তিনি ওর করমর্দ্দন ক'রবার জন্যে, নিজের একখানা হাত বাড়িয়ে দেন।

* * * * *

ক্যাসিও নিজের ক্ষুদ্র কক্ষটিতে ফিরে আসে। গোটানো বিছানাটা তক্তার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে-শুয়ে মর্ম্মান্তিক যাতনায় কতো কী ভাবতে থাকে :—পোলা তার ভগ্নি নয়—প্রেমিকা! এর জন্যে ক্যাসিও তার নিজের সম্মান, নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট ক'রেছে। নিজের আত্মীয়-স্বজনের মায়া পরিত্যাগ ক'রতেও, ওর কণামাত্রও সঙ্কোচ হয়নি। এই পোলাই তার জীবনের একমাত্র সুখ, একমাত্র সম্পদ্। এবং একে ভগ্নি ব'লে পরিচয় দেবার একটা কারণ আছে! ভগ্নি ব'লে পরিচয় না দিলে বোধকরি পোলা তাকে চিঠি লিখতে পারতো না! এই পোলাকে, তার হৃদয়ের একমাত্র কোহিনূরকে সে কি চিরদিনের জন্যে হারিয়ে ফেলবে? জেল-পরিচালক—তিনিও মানুষ হিসেবে অনেক বড়ো। তাঁর উজ্জ্বল-ভবিষ্যৎ সুপ্রতিষ্ঠিত। এঁর সঙ্গে পোলার বিয়ে হ'লে, ওর সুখ-ঐশ্বর্য্যের সীমা থাকবে না। তবে তার কী অধিকার আছে—পোলার সেই জীবনের চমৎকার ভবিষ্যৎ

নষ্ট ক'রে দেবার? পোলার জন্যে ওর স্বার্থত্যাগ, জগতের একটা আলোচনার বস্তু। ওর স্বার্থত্যাগ মনে হয় জগতের ইতিহাসে স্থান পাবে

কিন্তু তা' সত্ত্বেও, পোলা তো স্বার্থত্যাগ ক'রতে কোনো দিন তাকে অনুরোধ করেনি। এর বিনিময়ে তার, মানে, পোলার সমস্ত জীবনটাই কি সে দাবী করবার স্পৃহা রাখে? যে কোনো ক্ষেত্রে সেই মেয়েটিকে নিজের ভবিষ্যৎ বেছে নিতে দেওয়া ভালো।

কিন্তু ক্যাসিওর হৃদয়ের সমস্ত জায়গা জুড়ে অধিষ্টান ক'রছে পোলা, তার সেই দশবছরের ভালোবাসার পোলা। ক্যাসিওর মন এইসব চিন্তায় সন্তুষ্ট হ'তে পারলো না। সে বিষণ্ণ হ'য়ে উঠলো।

* * * * * *

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে ঐ সব চিন্তা ক'রে ক্যাসিও শয্যার ওপর উঠে ব'সলো। এবং পরক্ষণেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, যা' হয় হোক্। সমস্ত ব্যাপারটা তাকে আমি খুলে ব'লবো। কিন্তু তখুনি অস্ফুট-কণ্ঠে আপন মনেই ব'ল্লো, না—না, ব'লবো না। কারো কথাই প্রকাশ ক'রবো না। সে-সব কথা তার জানবার কোনো অধিকার নেই।

কিন্তু নিজেরই এই উক্তিতে ক্যাসিও মনে-মনে পরম বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলো। চীৎকার ক'রে ব'ল্লো, কিন্তু আমি কি অকৃতজ্ঞ? মনুষ্যত্বের ছাপও কি নেই?

ব'লতে ব'লতে সে বিছানা পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালো। ঝাঁঝরি-সম্বলিত উন্মুক্ত বাতায়নের সন্নিকটে এসে, বাইরের আকাশ

পানে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে দেখতে পেলে—স্বচ্ছ শাদা মেঘগুলি আকাশের গায়ে জমা হয়ে উঠছে।

এই মেঘগুলি দেখতে হয়েছে ঠিক্ মর্ম্মর-নির্ম্মিত সোপান-শ্রেণীর মতো। এবং সেই আলোক-বিকাশী সোপান শ্রেণী অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছে—দুর্লঙ্ঘ্য উচ্চতায়। এর সৌন্দর্য্যে ক্যাসিওর মন ছুটে গেলো নিজের গৃহের পানে। তার মনে হলো, সে বুঝি ঐ শুভ্রমেঘের মর্ম্মর-সদৃশ সোপান-শ্রেণীর সাহায্যে, নিজের দেশে—নিজের ঘরে গিয়ে উঠেছে। ক্যাসিও মনে-মনে ব'ল্লো, তাঁর জন্যেই আমার এতো শীগ্গির মুক্তিলাভের আদেশ হয়েছে। তিনি কতো চেষ্টাই-না ক'রেছেন! আর কিছুদিন এমনি থাকলে, হয়তো আমাকে আত্মহত্যা ক'রতে হতো। হয়তো আমি উন্মাদ হয়ে যেতাম। কিন্তু রক্ষা ক'রেছেন, জেল-পরিচালক। না, আমি সমস্তই খুলে ব'লবো। ফলাফলের দিকে গ্রাহ্যমাত্রও ক'রবো না।

*　　*　　*　　*　　*

ক্যাসিও জেল-পরিচালকের সঙ্গে দেখা ক'রলো। ব'ল্লো, স্যার, যে-বিষয় আজ সকালে আপনাকে বলবার জন্যে, আমাকে আদেশ ক'রেছিলেন, সেই বিষয় আমি চিন্তা ক'রেছি।

—বেশ, বেশ!

জেল-পরিচালকের মন দুরু-দুরু ক'রে ওঠে।

ক্যাসিও অবিচলিত-কণ্ঠে ব'লে যেতে লাগলো:—

আজ দশবছর আমার নিজের দেশের একটি অবিবাহিতা মেয়েকে ভালোবেসে আসছি। তার ঐশ্বর্য্য ছিলো প্রচুর। একজন অভি-

ভাবকের তত্ত্বাবধানে সে ছিলো। কেননা তার বাপ, মা, কেউ জীবিত নেই। এক কথায় সে অনাথা। আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন কয়েক বছরের জন্যে দেশ ছেড়ে আমাকে থাকতে হয়। ফিরে এসে দেখলাম, সেই মেয়েটি তার অভিভাবকের কাছ থেকে মর্ম্মান্তিক যাতনা পাচ্ছে। তার অভিভাবক তাকে অযথা নির্য্যাতন ক'রছে। তার কোনো অভিযোগে কর্ণপাতও করে না। বিচার নেই, সহানুভূতি নেই—শুধু অত্যাচার। কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। তার সমস্ত সম্পত্তি অভিভাবক মশাই আত্মসাৎ ক'রে নিলে। দিন-রাত্রি তাকে ভয় দেখাতো এই বলে যে, সম্পত্তি নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি ক'রলে গলা টিপে খুন ক'রবে। তারপর একদিন সুযোগ এলো। বহু চেষ্টার পর তার সঙ্গে আলাপ ক'রে বুঝলাম, সে আমাকে ভালোবাসে। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, তার সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে, তাকেই ফিরিয়ে দোবো। সে ব'ল্লে, এসো, আমরা পরস্পরে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হই। চলো আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। কিন্তু তখন আমার অনেক বাধা-বিপত্তি ছিলো, সেইজন্যে তার কথায় রাজী হ'তে পারলাম না। বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে, তাকে একদিন সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম। এনে আমার কর্ত্তব্যের দিকে মন দিলাম!

ক্যাসিও বাইরের পানে মুখ ফিরিয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে পুনশ্চ ব'ল্লে, আন্দাজ ক'রতে পারেন, আমি কি ক'রেছিলাম? আমার স্থির বিশ্বাস আপনি পেরেছেন। তার অভিভাবকের নাম আমি জাল ক'রেছিলাম। সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'লাম। কিন্তু সমস্ত অর্থ আমি সেই মেয়েটিকে দিয়েছিলাম। আমার এই কীর্ত্তি যথাসময়েই

জানাজানি হয়ে গেলো। পরিণামে হলো—আমি জাল করার অপরাধে ধরা পড়লাম। লোকে আমায় ছি-ছি ক'রতে লাগলো। আমার সামান্য কিছু অর্থ, সম্পত্তি ছিলো। সে সব নিলে কেড়ে। আমার আত্মীয় স্বজনেরা আমায় ত্যাগ করলে। এই -বিশাল পৃথিবীর বুকে আমার সে ছাড়া আর কেউ রইলো না। এবং সে হলো ঐ পোলা, স্থার সেই পোলা।

জেল-পরিচালক নিস্তব্ধ, নীরব হয়ে বসে রইলেন। তাঁর মুখ দিয়ে একটা কথাও সরলো না। আর বলবার তাঁর আছে কি? তিনি মৌন হ'য়ে শুধু উপলব্ধি ক'রতে লাগলেন যে, ক্যাসিওর কাহিনী এবং নিজের কাহিনী অসম্ভব মনে হ'লেও সম্পূর্ণ সত্যি !

—আশ্চর্য্য, অসম্ভব—তাই না? হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না! জেল-পরিচালককে ক্যাসিও ব'ল্লো, আমাকে কেউ ব'ল্লে বিশ্বাস হতো না।

হাতের নখের সাহায্যে আঙ্গুলের ওপর অন্যমনস্কে আঘাত ক'রতে ক'রতে জেল-পরিচালক ব'ল্লেন, মনুষ্য-জীবন বৈচিত্র্যেপূর্ণ। ভাগ্য কাকে কোন্ দিকে নিয়ে যায়, কেউ ব'লতে পারে না।

ক্যাসিও তাঁর কথায় ওঁর মুখপানে দৃষ্টিপাত ক'রলেন। দেখলেন, জেল-পরিচালকের সমস্ত মুখখানি ব্যথায় টন্-টন্ ক'রে উঠেছে।

ক্যাসিও ব'ল্লো, আমার জন্যে আপনি যা' করেছেন, তার তুলনা নেই। আমি এই জন্যে আপনার কাছে চির-ঋণী। আমার যথাসাধ্য

আপনার ঋণ শোধ ক'রবো! স্যার, আমি আর যাই হই—অকৃতজ্ঞ নই। অকৃতজ্ঞতার রক্ত আমার দেহে নেই।

—তুমি কী ব'লতে চাও, ক্যাসিও? তোমার এসব……

—আমাকে ব'লতে দিন। আমার কর্ত্তব্য—সত্যিটা আপনাকে জানানো। আপনি আমার এতো উপকার ক'রেছেন, এতো ভদ্রব্যবহার আমার প্রতি দেখিয়েছেন যে,—আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, ভদ্রলোকের কথা দিচ্ছি—আমি সব কিছুই আপনার জন্যে……

জেল-পরিচালক নিজের কানকে বিশ্বাস ক'রতে পারছিলেন না। পরমবিস্ময়ে প্রশ্ন ক'রলেন, কী ব'লছো—তুমি কী ব'লছো।

—ভেবে দেখলাম, পোলাই একমাত্র এ-সমস্যার সমাধান ক'রতে পারে। তাকে আমি সব জানাবো। কণামাত্রও গোপন ক'রবো না। ঠিক ভাইয়ের সম্পর্ক নিয়ে তাকে ব'লবো। ভাইয়ের দাবী নিয়ে। স্যার, ভাইয়ের দাবী নিয়ে। এর একচুলও ব্যতিক্রম হবে না।

—আরে না, না! তুমি ব'লছো কী ক্যাসিও?

—শুধু এই নয়। আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আজই পোলাকে লিখে জানাতে পারি। তার জবাব না আসা পর্য্যন্ত এখানেই আমি প্রতীক্ষা ক'রবো। যখন জবাব এসে পৌঁছবে, হয়তো তখন আমার আর বাড়ী ফিরে যাবার কোনো প্রয়োজন হবে না!

জেল-পরিচালক পুনরুক্তি ক'রলেন, তুমি কী ব'লছো?

কিন্তু এই পুনরুক্তি করার সঙ্গেসঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো, তাঁর অন্তরে লুপ্ত-শক্তি ফিরে এসেছে। ক্যাসিওর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ব'ল্লেন, না, না চিঠি লিখোনা। তুমি এখুনি বাড়ী

ফিরে যাও। আমি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রছি, তোমার জন্যে সেখানে অনাবিল আনন্দ প্রতীক্ষা ক'রছে। ঠিক্ ঠিক্—এ-জীবনটা একটা মধুর প্রেম ও সুললিত ছন্দে আপ্লুত। মনুষ্য-জীবন বৈচিত্র্যময়।

* *

*

কিন্তু ক্যাসিও ক্ষান্ত হ'তে পারছিলো না। জিদ প্রকাশ ক'রে ব'ল্লো, আমাকে চিঠি লিখতে অনুমতি দিন। আপনার প্রতি আমার যা' কর্ত্তব্য আছে, সেটা ক'রতে দিন। আমার কর্ত্তব্য ক'রবো। আমার ঋণ, আমি পরিশোধ ক'রবো। জগৎ জানুক—ভালোবাসার চেয়ে কর্ত্তব্য, মানুষের উপকারের প্রতিদান দেওয়া,—বড়ো, অনেক বড়ো। পোলা আমার হওয়ার চেয়ে, আপনার হ'লে অনেক সুখে থাকবে, অনেক আনন্দে থাকবে। আমার দিক দিয়ে সব চেয়ে বড়ো জিনিষ, পোলার সুখ-সুবিধে দেখা। আপনার কাছেই সে সেটা সম্পূর্ণ ভাবে পাবে।

জেল-পরিচালক ধৈর্য্যসহকারে সব শুনলেন। তাঁর চোখ দু'টি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে ব'ল্লেন, তোমার কর্ত্তব্য যদি হয় তাঁর কাছে নিজেকে কৃতজ্ঞ এবং মহৎভাবে পরিচয় দেওয়া, তা' হ'লে তাঁর, মানে পোলার কর্ত্তব্যও হবে—তোমাকে আনন্দ দেওয়া, তোমার এই কয়েদবাসের দুঃখকষ্ট লাঘব করা।

ক্যাসিও বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো, কিন্তু......

ওর কথাটা অসমাপ্ত র'য়ে গেলো। জেল-পরিচালক তার কথায়

প্রবল বাধা দিয়ে ব'ল্লেন, সবুর করো—আমাকে শেষ ক'রতে দাও। ব'ল্লেন, পোলা যদি ভিন্নরূপ ব্যবহার করেন, তা' হ'লে আমার, তাঁর সম্বন্ধে যে উচ্চ এবং মহৎ ধারণা আছে, সবই বাতাসের সঙ্গে ভেসে যাবে। পোলা মহৎ, পোলা উদার—ভালোবাসার মর্য্যাদা জানেন, সম্মান জানেন। ক্যাসিও, এটা সম্পূর্ণ সত্যি যে, তিনি কখনো তাঁর বহুদিনের প্রেমিককে মানে, তোমাকে প্রতারণা ক'রতে পারেন না। এ তাঁর স্বভাব নয়। এবং এই আমি চাই।

ব'লতে ব'লতে জেল-পরিচালকের চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠলো।

*   *

*

কিন্তু ক্যাসিও একটা কথাও ব'ল্লেনা। সে নীরবে বাইরের সেই উদ্যানের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রীষ্টের রজত-মূর্ত্তি

—এক—

কাউণ্ট-পত্নীর শোবার ঘরের দরজার ওপর দাঁড়িয়ে পরিচারিকা ব'ল্লো, মা, আপনার কফি এনেছি।

কাউণ্ট-পত্নী ওর কথার কোনো জবাব দিলেন না। বিছানার ওপর মশারী খাটানো। এই মশারীর ফাঁক দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়—তাঁর মাথাটা এখনো পর্য্যন্ত একটা শাদা বালিশের ওপর ন্যস্ত হ'য়ে আছে।

পরিচারিকা কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে ঘরের ভেতর এলো। ওর হাতে একখানা ট্রে। ট্রের ওপর প্রাতঃরাশের আহার্য্য সাজানো। সে পুনরায় একটু উঁচু-গলায় ব'ল্লো : মা, আপনার কফি এনেছি।

কাউণ্ট-পত্নী এবার শয্যার ওপর ওঠে বসেন। হাই তুলতে তুলতে বলেন : ঘরের মধ্যে একটু আলো আসতে দেনা রে।

তাঁর আদেশে পরিচারিকা বাতায়নের কাছে সরে আসে। হাতের ট্রে তার হাতেই থাকে। নামিয়ে কোথাও রাখে না। জানালার খড়খড়ি একহাত দিয়ে তুলে দেয়। এই সময় ট্রের ওপরকার কাপ, ডিসগুলিতে সংঘর্ষ হ'য়ে একটা বিশ্রী শব্দ বেরিয়ে আসে।

ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রীষ্টের রজত-মূর্ত্তি

কাউন্ট-পত্নী এই বিশ্রী শব্দে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ফিস্-ফিস্ ক'রে ব'ল্লেন: শব্দ করছিস কেন—এ্যাঁ? আজ ভোরবেলা এ-সব কী তোর হচ্ছে? দেখতে পাচ্ছিস্ নে, আওয়াজে আমার খোকারঘুম ভেঙ্গে গেলো?

সত্যি ছেলেটি জেগে উঠেছে। ও, ওর ছোট্টো বিছানায় শুয়ে কাঁদছে যে!

কাউন্ট-পত্নী ছেলের বিছানার দিকে ফিরলেন। ফিরে তখুনি শাসনপূর্ণস্বরে ব'ল্লেন: চ্—উ—প্!

কিন্তু কী আশ্চর্য্য! ছেলেটির তৎক্ষণাৎ কান্না যায় থেমে।

কাউন্ট-পত্নী পরিচারিকাকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্লেন: হ্যাঁ—এইবার আমার কফি নিয়ে আয়। একটু চুপ্ ক'রে থেকে ব'ল্লেন: ওকি—তুই অমন কাঁপছিস্ কেন? কি—কি হয়েছে তোর, এ্যাঁ?

কথাটা মিথ্যে নয়। কী একটা মর্ম্মান্তিক বেদনা ওর সমস্ত দেহটাকেই থর-থর ক'রে কাঁপিয়ে তুলছে। ওর হাত দিয়ে ধরা ট্রের ওপরকার জিনিষগুলি, সেই কম্পনে পরস্পরে ঠোকাঠুকি ক'রে, একটা রিনি-ঝিনি শব্দে বেজে উঠলো। এবং সেই শব্দে কাউন্ট-পত্নী বিরক্তি প্রকাশ ক'রে ব'লে উঠলেন: ওকি? ওকি?

তাঁর এই প্রশ্নের মধ্যে যথার্থই সন্দেহের এবং ভয়ের রেশ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে।

* * * *

কিন্তু পরিচারিকা পূর্ব্বের মতো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ব'ল্লে: না—না, ও কিছুনা। কিছু হয় নি তো! কী আবার হবে মা?

দাসীর জবাবে, কাউন্ট-পত্নী সন্তুষ্ট হ'তে তো পারলেন না, পরন্তু তাঁর আগ্রহ অধিকতর প্রবল হয়ে উঠলো। ওর একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরলেন। চেপে ধ'রে, একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উচ্চকণ্ঠে ব'ল্লেন: কিছু হয়নি মানে? নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। বল্—বল্ ব'লছি আমায়। তোকে ব'লতেই হবে।

খোকার—কাউণ্ট-পত্নীর একমাত্র ছেলেটির, ক্ষুদ্র মাথাটি এই সময়ে ওরই ছোট্টো খাটের ধার ঘেঁসে উঁচু হ'য়ে উঠেছে। বোধকরি ছেলেটি ওদের কথাবার্ত্তা বোঝবার চেষ্টা ক'রছে।

পরিচারিকা সজল-চক্ষে ব'ল্লো: কলেরা—কলেরা লেগেছে মা, কলেরা লেগেছে। পাড়ায় কলেরা লেগেছে।

শুনে কাউণ্ট-পত্নীর মুখখানি এক লহমার মধ্যেই কাগজের মতো শাদা হ'য়ে উঠলো! তাঁর লালিত্য-ভরা মুখখানি শুকিয়ে একেবারে এতোটুকু—যেনো মৃত্যুর কালো ছায়া তাঁর ওপর এসেছে নেমে।

উনি বিদ্যুৎচালিতের মতো উঠে দাঁড়ান। উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর ছেলেটির মুখের পানে দৃষ্টিপাত করেন। এবং পরক্ষণেই ইঙ্গিতে পরিচারিকাকে ঘর থেকে বেরিয়ে, পাশের ঘরে যাবার জন্যে আদেশ করেন।

পরিচারিকা কক্ষত্যাগ ক'রলে কাউণ্ট-পত্নী ছেলের খাটের কাছে এলেন।

ছেলেটি আবার কান্না স্বরু করে। উনি ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। কতো আদর করেন। অসংখ্য চুম্বনরেখা তার কচি-গালে এঁকে দেন। নিজে হাসেন, হেসে ছেলেকে হাসাবার চেষ্টা করেন। ওর সঙ্গে খেলা ক'রতে থাকেন। মন ভোলাবার কতো সুন্দর-

সুন্দর গল্প ব'লে যান। খোকা তার কান্না যায় ভুলে। মার সঙ্গে হাসে, খেলা করে।

* * * *

খোকাকে ভুলিয়ে কাউন্ট-পত্নী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাঁর পোষাক পরিবর্ত্তন ক'রলেন। আস্তে-আস্তে তাঁর পেছনের দরজাটা বন্ধ ক'রে এসে যোগদেন পরিচারিকাদের সঙ্গে।

বালিকা-পরিচারিকা কেঁদে ওঠে: হা-ভগবান।

আর একটি বয়ঃপ্রাপ্ত পরিচারিকা ফুপিয়ে কাঁদতে থকে। কাউন্ট-পত্নী ওদের মিনতি করেন: চুপ। চুপ কর বাপু তোরা। চেঁচাসনে—আস্তে। পাশের ঘরে খোকন আছে, হয়তো এখুনি ভয় পেয়ে উঠবে। না, না—ওকে ভয় দেখানো উচিত নয়, কখনো উচিত নয়।

এই পর্য্যন্ত নীচু গলায় ব'লে তিনি পুনরায় ফিস্-ফিস্ ক'রে ব'ল্লেন: হ্যাঁ, তারপর? তারপর সেটার কী হলো? কোথায়, কোন জায়গায় হয়েছে?

—এই খানে মা' এইখানেই। আমাদের নায়েবের বউ, রোজা। রোজাকে জানেন তো? সেই রোজার মাঝরাত্রি থেকে ব্যায়রাম, মা, মাঝরাত্রি থেকে ব্যায়রাম!

—ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। কিন্তু এখন—এখন সে কেমন?

—সে তো নেই। আধঘণ্টা আগেই মৃত্যু হয়েছে তার।

এইসময় পাশের ঘর থেকে খোকার কান্নার শব্দ পাওয়া যায়। কাউন্ট-পত্নী ব্যস্ত, হ্যাঁ নিতান্তই ব্যস্ত হয়ে পরিচারিকাকে বলেন: যা মা যা' ঘরের ভেতরে। খোকার সঙ্গে খেলা ক'রগে। ওকে খুশী

ক'রতে, শান্ত ক'রতে, যা' তোর ভালো ব'লে মনে হয়—তাই ক'রগে যা'। যা—এখুনি যা'। আমি এখুনি আসছি। তুই যা'।

এই ব'লে তিনি তাঁর স্বামীর কক্ষের দিকে পা' বাড়ালেন।

* * * * *

এই কলেরা-ব্যাধির ওপর কাউন্ট-পত্নীর একটা বিভীষিকা আছে। কলেরা শব্দটাই তাঁর কাছে যেনো একটা নগ্ন-মৃত্যু। ব্যাধিটিকে তিনি ভয় করেন--ভয়ানক ভয় করেন। এতো ভয় বোধকরি সাধারণতঃ আর কারো হয় না। কিন্তু একটা কথা আছে এর মধ্যে! তাঁর ভয়টা অহেতুক নয়। তিনি তাঁর ঐ এক মাত্র খোকাকে এতো ভালোবাসেন যে, অন্যান্য ছেলেদের মা পর্য্যন্ত ওঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। তা'—এই ছেলের জন্যেই তাঁর এই অস্বাভাবিক ব্যস্ততা! ছেলে—তাঁর খোকাকে তো রক্ষা ক'রতে হবে।

* * * *

কাউন্ট-পত্নী ঝড়ের মতো ঘরে ঢুক্‌লেন। স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে বিস্ফারিত চক্ষে ব'ল্লেন, : শুনেছো? শুনেছো একবার কাণ্ডটা? গেলো, গেলো সব গেলো। শশ্মান—শশ্মানের দৃশ্য চোখের ওপর যেনো নেচে বেড়াচ্ছে। ভগবান—ভগবান রক্ষা করুন।

কাউন্ট দাড়িতে ব্রাস দিয়ে সাবান ঘষছিলেন। স্ত্রীর কথায় হাতটা রুখলেন। ব'ল্লেন : হ্যাঁ—হ্যাঁ, ও আমি জানি।

শুনে কাউন্ট-পত্নী একেবারে বোমার মতো ফেটে পড়লেন : কী?

ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রীষ্টের রজত-মূর্ত্তি

তুমি জানো? জানো তুমি? জেনেও নিশ্চিন্তে, নির্ভবনায় বসে বসে কামাচ্ছো দাড়ি? তোমার আর কিছু কি করবার নেই? আশ্চর্য্য মানুষ! বাপের কর্ত্তব্য নেই? স্বামীর কর্ত্তব্য নেই। কলেরায় পট্-পট্ ক'রে লোক মারা-যাচ্ছে, আর তুমি ছেলের বাপ হয়ে, আমার স্বামী হয়ে, দিব্যি বসে আছো? ভাবনা নেই—চিন্তা নেই? ধন্যি মানুষ তুমি!

স্ত্রীর কথার ঝঙ্কার শুনে কাউণ্ট হাত দু'টি উর্দ্ধপানে তুলে একটা নিরুৎসাহের দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রলেন। ব'ল্লেন: সক্কালবেলা, কাক পক্ষী ডাকতে-না-ডাকতে এলে আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রতে? আজকের সমস্ত দিনটাই দেখছি খারাপ যাবে। ভগবান, তুমিই রক্ষা করো। হ্যাঁ ভগবান—শুধু ভগবানই আজ আমায় বিপদ থেকে রক্ষা ক'রতে পারে।

এই ব'লে তিনি স্ত্রীর মুখের ওপর কটাক্ষপাত ক'রলেন। এবং পরক্ষণেই ক্ষৌরকার্য্যে মন দিলেন।

কিন্তু কাউণ্ট-পত্নী সে কথায় ভগ্নোৎসাহ হলেন না। বরঞ্চ ওঁর মুখ-চোখ দেখে মনে হতে লাগলো—উনি আজ, এমনি প্রভাতকালে কী একটা নগ্ন বিভীষিকায়, নিজেকে অভাবিতভাবে উত্তেজিত এবং মুখর ক'রে তুলেছেন!

উনি হাত মুখ নেড়ে ব'ল্লেন, আমার হুকুম। কেউ গোলাবাড়ীর উঠোন থেকে আমার বাড়ীতে আসতে পারবে না। আমার বাড়ীব কোনো লোকও সেখানে যাবে না। কোচ্ম্যানকে ল্যাণ্ডোগাড়ী তৈরী রাখতে ব'লে দিচ্ছি। আধঘণ্টার মধ্যেই—হ্যাঁ নিশ্চয়ই আধ

ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়বো। কিন্তু, কিন্তু কোথায় যাই বলোতো। তুমি যেখানে ব'লবে যেতে, সেখানেই যাবো। বুঝলে সেখানেই যাবো। এখানে আর নয়। মৃত্যু—মৃত্যু ডাকছে এই বাড়ীটার প্রতি স্থান থেকে হাতছানি দিয়ে। নাও—নাও। উঠে পড়ো। দেরী ক'রো না!

কাউণ্ট ক্ষৌরকার্য্য সমাপ্ত ক'রে শান্তস্বরে ব'ল্লেন: কিন্তু—কী তুমি ক'রতে যাচ্ছো? ভেবে দেখছো না একবার? হঠকারিতা ভালো নয়। কোনো কাজেই হঠাৎ নামা উচিত নয়। অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কাজ করা কি তোমার কুষ্ঠিতে লেখেনি?

কাউণ্ট-পত্নী মুহূর্ত্তের মধ্যেই অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলেন। অস্বাভাবিক তীব্রকণ্ঠে ব'ল্লেন,: হঠকারিতা? আমার মন হঠকারিতায় পূর্ণ? কোনো কাজ আমি ভেবে চিন্তে ক'রি না? কী ক'রে তুমি এ-কথা ব'ল্‌তে পারলে?

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার ব'লতে সুরু ক'রলেন: তোমার কথা—সব কথা আমি শুনতে প্রস্তুত। কিন্তু—কিন্তু যখন জীবন-মরণের প্রশ্ন এসে হাজির হয়, যখন আমার ছেলের জীবন সংশয়াপন্ন, তখন কারো কথাই আমি শুনতে চাইনে। এখুনি—এই মুহূর্ত্তেই, আমি এই স্থান ত্যাগ ক'রতে চাই। বুঝলে—এই মুহূর্ত্তেই।

পত্নীর কথায় কাউণ্ট মনেমনে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠলেন। এখুনি, এই মুহূর্ত্তে, এই বাড়ী পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র যাওয়া তাঁর কাছে সত্যি-সত্যি অসম্ভব ব'লেই মনে হলো। তাঁর কাজ-কারবার আছে। এই সংসারের অনেক একান্ত-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আছে।

এগুলির একটা সুবন্দোবস্ত না-ক'রে কেমন ক'রে অতর্কিতে এ-বাড়ী পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র যাওয়া সম্ভব হয়? দু'-চার দিন তো সময় দেওয়া আবশ্যক। এই সময়টুকুর মধ্যে না হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করা যেতে পারে। না—না, তিনি কোনো মতেই ঐ সময়টুকুর পূর্ব্বে কোথাও যেতে পারেন না—কখনো না।

কাউন্ট, স্ত্রীর মুখের ওপর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে প্রবল আপত্তি জানালেন। ব'ল্লেন: না, এ কী ক'রে সম্ভব হ'তে পারে? চলো, ব'ল্লেই কি যাওয়া যায়? আমার কাজ-কর্ম্মের কতো ক্ষতি হবে, তা তোমার ধারণা নেই, না কিছুতেই নেই। তোমার দেখছি সব তাতেই............

স্ত্রী বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন: কাজ-কর্ম্ম? এই বুঝি তোমার কাজ-কর্ম্ম নিয়ে পড়ে থাকার সময় এ্যাঁ? মৃত্যু যেখানে আসছে ঘনিয়ে, সেখানেও তুমি ধন-সম্পত্তি নিয়ে থাকবে পড়ে? প্রাণ বাঁচাবার আমাদের খোকনের প্রাণ বাঁচাবার ক'রবে না কোনো চেষ্টা? ছিঃ ছিঃ! এ কী তোমার মনোবৃত্তি?

—কিন্তু আমাদের পরবার জামা-কাপড় তো কিছু নিয়ে যাওয়া দরকার সঙ্গে ক'রে? গোছগাছ করবার জন্যে তো কিছু সময় আমাদের চাই।

কাউন্ট-পত্নী ভ্রূকুঞ্চিত ক'রলেন। ব'ল্লেন: সময় চাই—এর জন্যে তোমায় দিতে হবে দু'-মাস সময়, না? ফু! তোমার কী বুদ্ধি-শুদ্ধি সব নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে? আমি তোমায় কথা দিচ্ছি—একঘণ্টার আগেই আমাদের ট্রাঙ্ক জামা-কাপড়ে নোবো ভর্ত্তি ক'রে—বুঝেছো?

—কিন্তু যাবে ব'লেই তো আর যাওয়া হয় না। যাবার একটা জায়গা তো চাই। কোথায় যাবে শুনি?

—প্রথমে ইষ্টিশানে। তারপর যেখানে তুমি যেতে বলো, সেইখানেই যাবো। নাও, নাও। আর দেরী ক'রোনা। ঘোড়া তৈরী রাখতে বল'গে।

কাউণ্ট বিরক্তি প্রকাশ ক'রে ব'ল্লেন, থাক—যথেষ্ট হয়েছে। সকাল বেলা আর বেশী বকাবকি ক'রো না। তোমার কথায়ই রাজী হলাম। এখুনি—এখুনি চলো। চুলোয় যাক আমার কাজ-কর্ম্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য। খেতে পাই আর না পাই,—তোমার সঙ্গে এই মুহূর্ত্তেই এখান থেকে পালানোই সব চেয়ে আবশ্যকীয় ব্যাপার। বেশ চলো।

* * * * *

কাউণ্ট-পত্নী নিজে প্রসাধনে যেতে ওঠেন। প্রসাধন সারেন অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। তারপর যুক্তহস্তে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা সমাপ্ত হ'লে, বেল দিয়ে দাস-দাসীকে আহ্বান করেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত বাড়ীটায় একটা সোরগোল পড়ে যায়। দাস-দাসীরা তর্-তর্ ক'রে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা ক'রতে থাকে। কেউ হাসে। কেউ চীৎকার করে। কেউ আর একজনের নাম ধ'রে ডাকাডাকি করে। গোলাবাড়ীর সুমুখের বাতায়ন গুলি কাউণ্ট-পত্নীর আদেশে, দাস-দাসীরা দেয় বন্ধ ক'রে। এবং এই বাতায়ন গুলি বন্ধ ক'রে দেওয়াতে, গোলাবাড়ী থেকে মাতৃহারা শিশুদের ক্রন্দন আর এ-বাড়ীতে ভেসে আসে না। ঐ গোলাবাড়ী থেকে একটু পূর্ব্বেও

ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রীষ্টের রজত-মূর্ত্তি

ক্লোরিণের একটা দুর্গন্ধ এ-বাড়ীর জানালাগুলি ডিঙিয়ে ভেতরে আসছিলো। কিন্তু জানালাগুলি বন্ধ ক'রে দেওয়ার জন্যে, সেই বিশ্রী গন্ধটা থেকে এখন নিস্তার পাওয়া যায়।

কাউণ্ট-পত্নী ক্রুদ্ধস্বরে দাসীদের বলেন: ঈঃ কী বিশ্রী গন্ধ আস ছিলো ক্লোরিণের। কিন্তু কী বোকা ওরা। ক্লোরিণ ব্যবহার ক'রে সমস্তই নষ্ট ক'রে ফেলছে। ক্লোরিণ—ক্লোরিণে হবে কি? ছাই হবে! মাঝখান থেকে একটা উৎকট গন্ধ এসে মানুষকে রুগ্ন ক'রে তুলবে! নাও,—ট্রাঙ্কে সব ভর্ত্তি করো। ও—ক'রেছো ভর্ত্তি! আচ্ছা, এবার ওগুলোতে চাবি দাও।

একটু চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বলেন: ক্লোরিণ ব্যবহার ক'রে কোনো ফল নেই। তার চেয়ে বরং সমস্ত পুড়িয়ে ফেললে কাজ হয়। ব্যাধি প্রসার লাভ ক'রতে পারে না। কেমন কি না?

* * * * *

কাউণ্ট প্রস্তুত হ'য়ে এসেছেন। এসেছেন, তাঁর স্ত্রীর কক্ষে। দাস-দাসীদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে, স্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লেন: এদের সবাইকে নিয়ে যাবে নাকি? কী সর্ব্বনাশ! এতো গুলো লোককে নিয়ে……

কাউণ্ট-পত্নী বাধা দেন। বলেন: তোমার যা' ইচ্ছে। ওদের যদি নিয়ে না যাও, তবে অন্য জায়গা পাঠিয়ে দাও। এখানে, এই বাড়ীতে থাকা, সম্পূর্ণ বিপদ-জনক। আমি চাইনে, সত্যি আমি চাইনে—ওদের কলেরা হোক।

একটু থেমে আবার বলেন: আমি চাইনে, আমার ঘর, আর ভালো ভালো গাউনগুলো ক্লোরিণ ছড়িয়ে ওরা দেবে নষ্ট ক'রে। হাজার হোক ওরা মাইনে করা লোক। আমাদের ভালো ভালো জিনিষ গুলোর ওপর দরদ থাকবে কেন বলো?

শুনে কাউণ্ট দুঃখের আতিশয্যে মৃদু ভৎর্সনা ক'রে ব'ল্লেন: তুচ্ছ ব্যাপারে তুমি এতো অধীর হ'য়ে উঠ্‌ছো? তারপর, তারপর দেখো তুমি কতোখানি স্বার্থপর হ'য়ে পড়েছো! চোরের মতো এখান থেকে চাইছো তুমি সরে পড়তে? ছিঃ—ছিঃ। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত,—হ্যাঁ নিশ্চয়ই লজ্জা হওয়া উচিত। ভীতু—ভীতু তুমি। অত্যন্ত ভীতু!

স্বামীর এই শ্লেষপূর্ণবাক্যে স্ত্রীর জ্র-দু'টি কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। দু'-হাত দু' দিকে প্রসারিত ক'রে উত্তেজিত হ'য়ে বলেন: ধন্য—ধন্য তোমরা পুরুষ মানুষ। যে-কথা এইমাত্র ব'ল্লে, সে-কথা সত্যিই তোমাদের, মানে পুরুষ মানুষদেরই মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। পুরুষ মানুষে এমনি অবিবেচক হয়।

এই ব'লে তিনি জিব এবং তালুর সংযোগে একটা অব্যক্ত শব্দ ক'রে পুনরায় বলেন: সংসার—তোমার সংসারের নির্ব্বিঘ্নতা, তোমার চোখে হ'য়ে উঠলো নগণ্য—উপেক্ষার বস্তু! আর যতো কাজের, যতো আদর্শের হ'য়ে দাঁড়ালো—এমনি দুঃসময়ে সাহসী হওয়া? বলেন: তুমি আমায় ব'লছো, আমি স্বার্থপর। কিন্তু নিজের দিকে একবারও ফিরে দেখছো না? তুমি নিজেই তো স্বার্থপর। কেননা

তুমি মনে ক'রছো, এমনি ক'রে এখান থেকে চ'লে গেলে, লোকে তোমায়—ছি, ছি, ক'রবে। জনপ্রিয়তাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

কাউণ্ট-পত্নী ক্ষণকালের জন্যে মৌন থেকে পুনরায় সুরু করেন: আচ্ছা, তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে যদি তোমার এতোই আগ্রহ, তবে তুমি মেয়রসাহেবকে ডেকে তাঁর হাতে একশোটি লায়ার দিয়ে এই জায়গার কলেরা রুগীদের ভালো ক'রে চিকিৎসা করা র বন্দোবস্ত ক'রছো না কেন?

এ-কথার প্রত্যুত্তরে কাউণ্ট কোনো কথা ব'ল্লেন না। শুধু দাস-দাসীদের আদেশ ক'রলেন, তাদের আরো কতোকগুলি দরকারী জিনিষ ভরে রাখতে।

*　　*　　*　　*　　*

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আরো গোটা তিন-চার ট্রাঙ্ক কানায়-কানায় ভরে উঠলো।:- তাঁদের খোকার খেল্‌নাই বা কতো রকমের! কাঠের ঘোড়া, ডল-পুতুল, ফুটবল, দম দেওয়া মোটর গাড়ী,—এগুলি সমস্তই ট্রা.ঙ্ক ঠাসাঠাসি ক'রে রাখা হলো। তারপর, কতো রংয়ের কতো ভালো ভালো পোষাক! দরকারী, অদরকারী—অনেক জিনিষে ট্রাঙ্ক উঠলো ভর্ত্তি হ'য়ে। এমনি ভাবে ভত্তি হ'য়ে উঠলো যে, এর ডালা কিছুতেই যায় না বন্ধ করা। গায়ের জোর দিয়েই ট্রাঙ্কগুলির কালা বন্ধ করা সম্ভব হলো।

ট্রাঙ্কগুলিতে তালা লাগিয়ে কাউণ্ট-পত্নী এ-ঘর ও-ঘর ক'রতে লাগলেন। টেবিলের ড্রয়ার ধ'রে টেনে দেখেন, চাবি দেওয়া হয়েছে কি না। আলমারীর পাল্লা ধ'রে টানাটানি করেন। দেখেন, সত্যি

এতে চাবি দেওয়া হয়েছে। কাউণ্ট, স্ত্রীকে অনুসরণ ক'রছিলেন। তিনিও ওঁর সঙ্গেসঙ্গে পরীক্ষা ক'রে দেখছিলেন। তার ব্যস্ততা দেখে মনে হলো—তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই এ-বিষয়ে উৎসুক হ'য়ে পড়েছেন।

কিন্তু এটা আশাতিরিক্ত। কাউণ্ট-পত্নী স্বামীর এই উৎসাহ দেখে, মনেমনে খুশী না হ'য়ে থাকতে পারলেন না।

—দুই—

মিনিট পনেরো-কুড়ি পর :—

ওঁদের ভিলার দরজায় ল্যাণ্ডো-গাড়া অপেক্ষা ক'রছে। যাবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। কাউণ্ট-পত্নী যাত্রার পূর্ব্বে নিজের নিরালা শয়ন কক্ষে ফিরে আসেন। এখানে এসে উনি শেষবারের মতো প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা করেন, একখানা চেয়ারের সুমুখে নতজানু হ'য়ে ব'সে। যুক্তহস্তে উর্দ্ধপানে তাকিয়ে ভগবানকে স্মরণ করেন। ভগবানকে কাতর অনুরোধ জানান।

কিন্তু কাউণ্ট-পত্নীর এই অস্ফুট প্রার্থনায় এবং কাতর অনুরোধের মধ্যে একটা বিশিষ্টতা চোখে পড়ে।—: যে-সব হতভাগ্য শিশুরা, তাদের মাকে এই কলেরা-ব্যাধিতে হারিয়ে ব'সেছে চিরকালের মতো, তাদের জন্যে তিনি ভগবানের কাছে কোনো নিবেদনই জানান না। যারা, মানে যে-সব গরীব দীন-মজুররা, যে-সব হতভাগ্য চাষীরা, তাঁর এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের মূলে আছে, তাদের জন্যে ভগবানের

কাছে প্রার্থনা করেন না। যারা নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর সম্পদ্ খাড়া ক'রে দিয়েছে, তাদের যেনো এই কাল-ব্যাধি নিস্তার দেয়, এই উদ্দেশ্যে কোনো প্রার্থনাই উনি করেন না। কাউণ্ট-পত্নী নিজের জীবনের জন্যেও কাতর মিনতি জানান না। শুধু তাঁর খোকন—এই খোকনের জন্যে, এই খোকনের জীবন যাতে নিরাপদ থাকে, সেই প্রার্থনা, সেই কাতর অনুরোধ, তিনি ভগবানের কাছে করেন।

কাউণ্ট-পত্নী উঠে দাঁড়ালেন। গায়ের ওপর একটা বহিরাবরণ চাপিয়ে সম্মুখের বাতায়নটা দিলেন বন্ধ ক'রে। প্রভাতের ফুর্-ফুর্ ক'রে প্রাণ-মাতানো বাতাস বইছে; বাতাসে—আকাশের ওপর দিয়ে শাদা খণ্ড-খণ্ড মেঘগুলি যাচ্ছে ভেসে। ভিলার সুমুখে একটা উদ্যান। এই উদ্যানের ভেতরকার ঝাউ গাছগুলি মৃদু-মন্দ বাতাসে হেলে-দুলে হাত নেড়ে যেনো ওঁকে বিদায়-বাণী জানাতে চায়। কিন্তু ওঁর ওদিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর শিশুকালের কতো স্মৃতিই না-জানি এই উদ্যান, এই গাছপালার সঙ্গে মিশে আছে। কাউণ্ট-পত্নীর সে-সব ভুলেও স্মরণপথে পড়তে চায় না।

কাউণ্ট-পত্নী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন।

* * * * * * *

মেয়র এই খানিকক্ষণ হলো ওঁদের ঘোড়ার গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দাঁড়িয়েছেন একেবারে দরজার গা-ঘেঁসে।

মেয়র কাউণ্টের সঙ্গে কথা কইছেন। কাউণ্ট-পত্নী এসে উপস্থিত। উনি ওঁকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্লেন : আপনি কি বাড়ী থেকেই আসছেন ?

মেয়র সবিনয়ে উত্তর ক'রলেন: হ্যাঁ! বাড়ী থেকেই আসছি। আপনারা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন শুনে, আর থাকতে পারলাম না। ভাবলাম, যাই একবার না হয় দেখা ক'রে আসি। কি বলেন, ভালো ক'রিনি?

—বেশ ক'রেছেন।

এই ব'লে কাউন্ট-পত্নী খোকাকে কোলে নিয়ে গাড়ীতে উঠে ব'সলেন। ব'ল্লেন: কিন্তু এই সংক্রামক ব্যাধি ধ্বংস করবার আপনি তো কোনো উপায়ই ক'রলেন না দেখছি। এ রকম নিস্পৃহ থাকা মেয়রের পক্ষে ভারী অন্যায়, হ্যাঁ নিশ্চয়ই ভারী অন্যায়।

মেয়র বিনয়সূচক মৃদু-হাস্যে ব'ল্লেন, ক্ষমা ক'রবেন। আমার দোষ হ'য়ে গেছে।

কাউন্ট-পত্নী ব'ল্লেন: না, না; ক্ষমা চাইবেন না। আপনি মেয়র। আপনার কি ক্ষমা চাওয়া শোভা পায়?

এই সময়ে কাউন্ট গাড়ীতে উঠলেন। স্ত্রীর পাশে বসলেন।

কাউন্ট-পত্নী স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস-ফিস ক'রে প্রশ্ন ক'রলেন, ওঁকে, মানে মেয়রকে, টাকা দিয়েছো?

স্বামী নীরবে শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

মেয়র পুলকিতমনে কাউন্ট-পত্নীকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্লেন: আপনাকে ধন্যবাদ। সহস্র ধন্যবাদ। আপনার উদারতার, যার সঙ্গে······

কাউন্ট গাড়ীর ভেতর থেকে গলাটা বাড়িয়ে, বাধা দিয়ে ব'লে উঠলেন, না, না; ও কিছু না—ও কিছু না।

ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রীষ্টের রজত-মূর্তি

গাড়ীর ভেতরে ভালো ক'রে ব'সে কাউন্ট-পত্নী এবার সুমুখে অবস্থিত জিনিষগুলি বেশ ক'রে দেখে নেন। : হ্যাঁ—ব্যাগ, বাক্স, কোট, শাল, পুরুষের ও মেয়েদের ছাতা—সমস্তই ঠিক আছে। কোনোটাই নিতে ভুল হয়নি। স্ত্রীর দেখাদেখি কাউন্টও ল্যাণ্ডো-গাড়ীর পেছনে মাল রাখবার জায়গাটার ওপর দিয়ে কয়েকবার দৃষ্টিপাত করেন। ভাবটা এই যে, সমস্ত মালপত্তর ঠিক আছে কিনা জেনে নেওয়া।

হঠাৎ কাউন্ট প্রশ্ন করেন: এখানে একটা ছোটো ছেলে দেখা যাচ্ছে। ওর কী হলো ব'লো তো?

শুনে কাউন্টের স্ত্রী উত্তেজনায় ব'লে ওঠেন: সত্যি তো! কে যেনো কাঁদছে।

এই ব'লে তিনি গাড়ীর ফাঁক দিয়ে মুখটা বাইরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

একটা কৃষক ভৃত্যদের মালপত্তর গাড়ীর ওপর তুলতে সাহায্য ক'রছিলো। ওর সঙ্গে একটা ছোটো ছেলে। অতি বিশ্রী চেহারা তার। সেই কাঁদছিলো। কৃষকটার ছেলে সে। ওর বাবা ওকে ধমক দিয়ে ব'ল্লে: চুপ্। চুপ্ কর তুই হতভাগা! খালি ভ্যাঁ ভ্যাঁ ক'রে কাঁদলে হবে কি?

কাউন্ট-পত্নী জিজ্ঞাসা ক'রলেন: কী হলো তোর এ্যাঁ! এতো কাঁদছিস্ কেন?

ছেলেটি ফুঁপিয়ে ব'ল্লো: মা—আমার মার অসুখ। কলেরা—কলেরা হয়েছে তার!

শুনে এক নিমিষে কাউণ্টের স্ত্রীর মুখখানা শুকিয়ে কাগজের মতো শাদা হ'য়ে উঠলো। গোলাপ ফুলের মতো রাঙা গাল দু'টি বিবর্ণ, ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলো। গাড়ীর ভেতরেই তিনি একটা লাফ দিয়ে এদিক পানে সরে এলেন। এবং পরক্ষণেই কোচম্যান্‌কে ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে ব'ল্লেন: চালাও—শীগ্যির। শীগ্যির চালাও—জলদি।

আদেশমাত্রই কোচম্যান ঘোড়া দু'টির পিঠের ওপর সজোরে চাবুকের আঘাত ক'রলো। এরা হ্রেষারবে ছুটতে লাগলো। মেয়র এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎ ঘোড়া দু'টি গাড়ীটাকে টেনে নিয়ে সুমুখ দিকে অগ্রসর হ'তেই, তিনি লাফ দিয়ে এদিকে সরে এলেন। নইলে, গাড়ীর চাকা বোধ করি ওঁর পা-দুটিকে আস্ত রাখতো না। যাক্, মেয়র সাহেব খুব জোর বেঁচে গেছেন আজ!

গাড়ী চলতে সুরু ক'রলে কাউণ্ট একমুঠো তামার পয়সা সেই কৃষকটির পা' লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দিলেন। ও পাষাণের মতো স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখে। ছেলেটার কান্না তখনো থামেনি।

গাড়ীর চাকার ঘূর্ণায়মান গতির পানে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সেই কৃষকের, (যে জাতির প্রাণ, জাতির মেরুদণ্ড, জাতির ঐশ্বর্য্যের যা কিছু সব)—মুখ দিয়ে, অব্যক্ত অন্তর্যাতনায়, ধনী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটা অতি বিশ্রী শ্রুতিকটু-কথা এলো বেরিয়ে।

এই গালাগালিটা যেনো শুনতে পাননি, এমনি ভাব দেখিয়ে মেয়র সেখান থেকে চলে এলেন।

ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রীষ্টের রজত-মূর্ত্তি

কৃষকটীর বয়েস বেশী নয়। আধাবয়েসী। ছেলেটীর মতোই শুষ্ক, পাণ্ডুর চেহারা। সে ছেলটীকে দিয়ে রাস্তার ওপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পয়সাগুলি কুড়িয়ে নিলে। তারপর ওরা দু'জনে একসঙ্গে নিজেদের মাথা গোঁজবার আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে পা' বাড়ালে।

এই অভাগা কৃষকটীর জীবনের দুঃখের একটা ইতিহাস আছে। ও ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে কাউণ্ট-পত্নীর জমিদারীতে বাস করে। অতি সামান্য এতোটুকু একটা ঘরে কোনোমতে ওদের তিনজনের মাথা গোঁজবার স্থান। ক্ষুদ্র পরিবার। মাত্র তিনটি প্রাণী সংসারে। কিন্তু তবু, এই অল্প-পরিসর আশ্রয়ে ওদের বড়ো কষ্টে দিন কাটাতে হয়। ঘরের মাথার ওপর একটা চালা। কিন্তু এই চালাটা বৃষ্টির জল থেকে ওদের রক্ষা করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যখন বর্ষা নামে, তখন ওদের কষ্টের আর দুর্ভোগের অন্ত থাকে না। যেদিকে সরে যায়, সেইদিকেই বৃষ্টির জল ওদের অস্থির ক'রে তোলে। তারপর আবর্জ্জনার অত্যাচার। এখানে ওখানে আবর্জ্জনা থাকে জমা হ'য়ে। জমিদারের লোক পরিষ্কার ক'রে নিয়ে যায় না। ওরা দিনরাত্রি খালি মদ খায়। মদ খেয়ে আবার মাঝেমাঝে অন্যস্থানের আবর্জ্জনা বহে এনে, এইস্থানে জড়ো করে! এই কৃষকটী নিজের অভিযোগ জমিদারের কাছে অসংখ্যবার জানিয়েছে। কিন্তু কে, কার কথা শোনে? জমিদার এদের সুখ-সুবিধের দিকে উদাসীন।

* * * * * * *

ঘরের একপাশে কৃষকের স্ত্রী একখানা ছোটো তক্তার ওপর শুয়ে আছে। ওর মাথাটা শয্যার ধার ঘেঁসে বাইরের দিকে পড়েছে

ঝুঁকে। মুমূর্ষু অবস্থা ওর। কলেরা-রাক্ষুসী মৃত্যুর কালো-ছায়া ওর মুখের ওপর দিয়েছে বিছিয়ে। চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই, ওর এককালে সৌন্দর্য্য ছিলো—দেহে ছিলো কমনীয়তা। বয়েস বেশী নয়। খুব বেশী হয়তো তিরিশ-ই যথেষ্ট। কিন্তু কে এখন সে-কথা ক'রবে বিশ্বাস? এই বয়েসেই সে হ'য়ে উঠেছে বিগত-যৌবনা।

ঘরে আসতেই, কৃষকের স্ত্রী অতিকষ্টে, ক্ষীণকণ্ঠে ওর স্বামীকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্লে:

—খোকাকে এখান থেকে সরিয়ে দাও।

এই ব'লে ও কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব হ'য়ে রইলো। একসময় পুনর্ব্বার ব'ল্লে:

—খোকন, বাবা—তুমি তোমার কাকীমার কাছে যাওতো। আমার কাছে তোমায় থাকতে নেই বাবা!

তারপর স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লে:

—এখান থেকে ওকে নিয়ে যাও। ব'ল্লে, ধর্ম্মযাজককে পাঠিয়ে দাও শীগ্গির।

—যাচ্ছি। এখুনি আমি যাচ্ছি।

এই ব'লে কৃষক ছেলেটির দিকে ফিরে চাইলো। ওকে দরজা দেখিয়ে দিয়ে ব'ল্লে:

—যাও বাবা, তোমার কাকীমার কাছে যাওতো। দেখছো না, তোমার মার বড়ো অসুখ।

ছেলেটি সজলচক্ষে তার মরণাপন্ন মায়ের মুখের দিকে বহুক্ষণ নিঃশব্দেই রইলো চেয়ে। চেয়ে থাকতে থাকতে, ওর শুষ্ক গাল

দু'টির ওপর দিয়ে অশ্রুর বড়োবড়ো ফোঁটা গড়িয়ে প'ড়তে লাগলো।

এই দেখে ছেলেটির মারও কোটরগত চক্ষু দু'টি, অশ্রুতে চক্-চক্ ক'রে উঠলো। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে, অতিকষ্টে ব'ল্লে :

—ছিঃ খোকন কেঁদোনা। তুমি কাকীমার কাছে গিয়ে দু'একদিন থাকগে। তা' হলেই আমি আবার সেরে উঠবো।

ছেলেটি এবার, তার অশ্রুসিক্ত মুখখানির ওপর হাত দু'টি চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

*   *

*

এই ক্ষুদ্রঘরের বাইরে একটুখানি একটা রান্নাঘর। কৃষক ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। একগাদা খড় নিয়ে এলো জোগাড় ক'রে। বিছিয়ে রাখলো এই রান্নাঘরে। তারপর স্ত্রীর কাছে ফিরে এলো। কোমলকণ্ঠে ব'ল্লে :

—দেখো, ব'লতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু না ব'লে উপায়ও দেখছিনে। তুমি যদি এই বিছানার ওপর মারা যাও, তাহ'লে, এই বিছানাটাই আমাকে পুড়িয়ে নষ্ট ক'রতে হবে। তার চেয়ে বরং এক কাজ করো। রান্নাঘরে আমি অনেক খড় এনে মেঝেতে বিছিয়ে ভারী চমৎকার বিছানা তৈরী ক'রেছি। তুমি যদি······

কথাটা কৃষক শেষ ক'রতে পারলে না। পারলে না শতচেষ্টা ক'রেও। একটা প্রবল-সঙ্কোচ তাকে ভেতর থেকে বাঁধা দিলে।

কিন্তু কৃষক-পত্নী স্বামীর মনের ভাব বুঝতে পারে। ও তক্তা ছেড়ে অতিকষ্টে একটুখানি উঠতেই, স্বামী এসে দু'-হাত বাড়িয়ে তাকে পাঁজাকোলা ক'র তুলে নেয়।

কৃষকের স্ত্রী, অদূরে দেয়ালে টাঙ্গানো যিশুখ্রীষ্টের ক্ষুদ্র ক্রুশবিদ্ধ রজত-মূর্ত্তিটির কাছে নিয়ে যেতে স্বামীকে ইঙ্গিত ক'রলো। স্বামী স্ত্রীর আদেশ মতো দেওয়ালটার ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ওর হাতে ক্রুশ বিদ্ধ রজত-মূর্ত্তিটি তুলে দিতেই, ও সেটিকে বক্ষের ওপর অত্যন্ত ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে চেপে ধ'রলো। তারপর, নিজের ওষ্ঠদ্বারা সেটিকে ঘন-ঘন চুম্বন দিতে লাগলো। কৃষক এই অবস্থাই ওকে নিয়ে এলো রান্নাঘরে। খড়ের বিছানার ওপর শুইয়ে দিয়ে ধর্ম্মযাজকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো।

সেই জনমানবহীন বিশ্রী রান্নাঘরের একপাশে, খড়ের বিছানার ওপর শুয়ে, কৃষকের হতভাগ্য স্ত্রী। ওর দু'-চোখের কোণ বেয়ে, এবার শ্রাবণের ধারার মতো অশ্রু ঝ'রে পড়তে লাগলো। ও উপলব্ধি ক'রছে, বেশ ভালো ক'রেই উপলব্ধি ক'রছে—তার জীবন প্রদীপের তৈলের আধার নিঃশেষ হ'য়ে আসছে। হয় তো এখুনি, চিরকালের মতো প্রদীপটি নির্ব্বাপিত হ'য়ে যাবে। তাই, আজ যাবার দিনে, সে কাতরতার সঙ্গে প্রার্থনা ক'রতে লাগলো। প্রার্থনা ক'রতে লাগলো, তার আত্মার মুক্তির জন্যে। ওর বিশ্বাস, দৃঢ় বিশ্বাস—ও ক'রেছে

অনন্ত পাপ। এবং সেই পাপের জন্যেই তাকে এমনি অসহায় ভাবে মৃত্যুবরণ ক'রতে হচ্ছে।

—তিন—

মেয়র বোধকরি সংবাদটা পেয়েছিলেন। তাই তিনি দয়া ক'রে একজন ডাক্তার এখানে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এই ডাক্তারের শরীরে মেদের যেমন অভাব ছিলো না, মনে ভয়ের তেমনি প্রাচুর্য্য ছিলো। অসম্ভব ভীরু প্রকৃতির লোক.

রুগীর অবস্থা দেখে তিনি যেনো কেমন নার্ভাস হ'য়ে পড়লেন। প্রশ্ন ক'রলেন রুগীর স্বামীকে—ঘরে "র‍্যাম" বা "মারসালা" আছে কি—?

কিন্তু দরিদ্র কৃষক পরিবারে, এ-সব দামী মদ কি ক'রে পাওয়া যেতে পারে? কাজেই, ডাক্তার যখন শুনলেন, ও জিনিষ দু'টির, একটিও ঘরে নেই, তখন তিনি ব্যবস্থা ক'রলেন—গরম ইট কৃষক-পত্নীর পেটের ওপর দিতে।

ডাক্তার বেরিয়ে এলেন রুগীর ঘর থেকে। তার দেহে যেনো প্রাণ ফিরে এলো।

*　　*　　*　　*　　*　　*

ডাক্তার বিদায় নেবার ক্ষণকাল পরে ধর্ম্মযাজককে সঙ্গে ক'রে কৃষক আবার ঘরে ঢুকলো। ধর্ম্মযাজকের ভয় নেই, ভাবনাও নেই। তিনি

কৃষকের মুমূর্ষু স্ত্রীর শিয়রে দাঁড়িয়ে, ভগবানের নাম ক'রতে লাগলেন। শুনে স্ত্রীলোকটির মনে একটা স্বর্গীয় ভাব আশ্রয় ক'রলো এবং এই স্বর্গীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে সে পরম শান্তিতে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা ক'রতে লাগলো।

ধর্ম্মযাজকের কাজ শেষ হ'লে, তিনি বেরিয়ে এলেন। কৃষক আরো দু'-মুঠো খড় এনে, স্ত্রীর পিঠের তলায় স্থাপন ক'রলো। এবং ডাক্তারের নির্দ্দেশমতো ঘরের একপাশে আগুন জ্বাললে। জ্বাললে ইঁট উত্তপ্ত করবার জন্যে।

কৃষক-পত্নী এতক্ষণ সেই ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রীষ্টের ক্ষুদ্র রজত-মূর্ত্তিটা হাতে ক'রে নিয়ে চুপ ক'রে শুয়ে ছিলো। এখন সে হঠাৎ ঐ রজত মূর্ত্তির ক্রুশটাকে প্রাণভরে চুম্বন ক'রতে সুরু ক'রলো। চুম্বন ক'রতে ক'রতে তার মনটা ফিরে গেলো—তাঁর দিকে, যিনি এটিকে,—ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রীষ্টের এই রজত-মূর্ত্তিটিকে,—দান ক'রেছিলেন। এখন থেকে ষোলবছর পূর্ব্বে, বর্ত্তমান কাউণ্ট-পত্নীর মার আদেশে, মেয়ে তাঁর কৃষকের কন্যাকে এটি উপহার দিয়েছিলেন। তখন এই কাউণ্ট-পত্নী, মানে যিনি কলেরার ভয়ে গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে সরে পড়লেন, তিনি সম্প্রতি যৌবনের সাক্ষাৎ পেয়েছেন নিজের দেহে। তাঁর মা' এখন বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর সুকীর্ত্তি তাঁকে এখনো লোকের মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছে। এবং বোধকরি অনন্তকাল ধ'রে বাঁচিয়ে রাখবে।

কৃষকের স্ত্রী এখন অনুতপ্ত। অনুতপ্ত এই কারণে যে, সে বহুবার বর্ত্তমান কাউণ্ট-পত্নীর বিরুদ্ধে তার স্বামীর কাছে অভিযোগ ক'রেছে। এবং এই অভিযোগের ওপর ভিত্তি ক'রে তার স্বামী আবেদন ক'রেছে

কাউণ্টের স্ত্রীর কাছে—তাদের ঘর-দোর মেরামত ক'রে দেবার জন্যে। কিন্তু তার সেই আবেদন কাউণ্ট-পত্নী কানে তোলেন নি। এবং সেই জন্যে, তার স্বামী পরমদুঃখে তাঁকে কতো বারই না অভিসম্পাত ক'রেছে !

কৃষকের স্ত্রী এর জন্যে, আজ তার জীবনের শেষদিনে, মনে মনে কাউণ্ট এবং কাউণ্ট-পত্নীর কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রতে লাগলো। ভগবানের কাছে সে এই প্রার্থনা ক'রলে, যেনো তিনি এই কাউণ্ট-দম্পতির কোনো অমঙ্গল না করেন।

* * * * * *

ডাক্তারের নির্দ্দেশমতো উতপ্ত ইঁট রুগীর পেটের ওপরে রাখবার মুহূর্ত্তকাল পরেই কৃষকটি দেখলে, তার স্ত্রীর দু'চক্ষু উঠেছে কপালে। একবার সমস্ত শরীরটা, ভেতরের কী এক অদৃশ্য-শক্তিতে হঠাৎ থর্-থর্ ক'রে কেঁপে উঠলো। তারপর সব শেষ।

সেই দিন অপরাহ্ণে কাউণ্টের কয়েক জন ভৃত্য, মনিবের খাশ বৈঠকখানায় ব'সে পরম তৃপ্তির সঙ্গে "র‍্যাম" এবং "মারসালা" পান ক'রছিলো।

সানন্দ সঙ্গ

—এক—

বৃষ্টি পড়ছে। সমস্ত দিন ধ'রে বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তা-ঘাট কদ্দমাক্ত। বিশ্রী—অতি বিশ্রী দিন। মানুষের মন অজানা কী একটা সুরে আপ্লুত হ'য়ে ওঠে। কিছু ভালো লাগেনা!

গিগি ক্যাভালারী বা পিভিয়ন। একই লোকের দু'টি নাম। পোষাকী আর আটপৌরে। গিগি ক্যাভালারী, এই নামটি হলো পোষাকী। পিভিয়ন, নামটি হলো আটপৌরে।

* *

*

পোটারোমনা শহর থেকে বেরিয়ে এলো গিগি। পায়ে জুতো আছে বটে, কিন্তু তাতে হিল্ নেই। মাথায় ছাতা নেই। পায়ের গতির সঙ্গে পথের কাদা উঠছে তার পা'-জামাতে। বৃষ্টিতে ভিজে সে ঠিক্ কাকের মতো হ'য়ে উঠলো। মাথার টুপি বেয়ে বৃষ্টির জল ওর দেহের চারিদিকে ঝর্ণার ধারার মতো গড়িয়ে পড়ছে। পড়ুক—তাতে ওর কোনো ক্ষতি নেই। কোনো ভ্রূক্ষেপও নেই

তার। যেনো এমনি জলে ভেজা, ওর দৈনন্দিনের সহ্য করা ব্যাপার।

গিগি অগ্রসর হয়। পায়ের গতি দ্রুত, অথচ সতর্ক। চলতে চলতে ও পেছন ফিরে দৃষ্টিপাত করে, এবং পরক্ষণেই সুমুখভাগে অবস্থিত গাছ—ঝাউগাছের দিকে চোখ ফিরিয়ে চায়। পথে লোক নেই। কে—এই দুর্য্যোগে বেরুবে?

* *

*

গিগি একটা ছোটো বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর পরিশ্রমক্লান্ত দেহটা অবশ হ'য়ে পড়েছে। চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ও পকেট থেকে একটা চাবি বের ক'রলো। দরজা খুলে ভেতরে এসে আবার ওটা দিলে বন্ধ ক'রে।

তারপর অতি কষ্টে সিঁড়ি বেয়ে একটা অপরিষ্কার ছোট্টো ঘরে এসে পৌছলো।

এই ঘরে বিছানার ওপর একটি মেয়ে শায়িত। পরণে তার সুদৃশ্য পোষাক। মাথার চুল সুশ্রী, সুন্দর। ওর রাঙা চোখ দু'টি দেখলে বোঝা যায় যে, প্রবল জ্বরে সে পীড়িত। সিঁড়ির ওপর পায়ের শব্দে সে ধীরে ধীরে দরজাটার দিকে কোনো মতে মাথাটা দিয়ে ছিলো ফিরিয়ে! এখন গিগিকে দেখতে পেয়ে ওর সমগ্র মুখমণ্ডল একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। ওষ্ঠের পাশ ঘেঁসে একটা তীব্র হাস্যরেখা, বিদ্যুতের মতোই গেলো খেলে।

মেয়েটির পায়ের দিকে একটি ক্ষীণ দুর্ব্বল বৃদ্ধা ব'সে। গিগি তাঁকে নিম্নস্বরে প্রশ্ন ক'রলো, ও আছে কেমন ?

বৃদ্ধা ব'ল্লেন, ও তো একই রকম আছে।

শুনে গিগির মন বিরক্তি এবং অসন্তোষে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। পকেটের ভেতর থেকে কাগজেমোড়া একটা বাক্স বের ক'রে ব'ল্লে, আমি কুইনাইন্ এনেছি।

এই ব'লে সে মাথা থেকে টুপি খুলে এক জায়গায় রাখলো। গায়ের ভিজে কোটটা খুলে রাখলে একটা হুকে টাঙিয়ে। মেয়েটি তখনো পর্য্যন্ত ওর দিকে স্মিতহাস্যে চেয়ে ছিলো। গিগিও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ওর মুখের পানে নির্নিমেষে চেয়ে রইলো। গিগির শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে পাপের, অনিদ্রার এবং ভীতির রেখা মূর্ত্ত হ'য়ে রয়েছে। ওর অন্তরে সহসা প্রীতির এবং ভালোবাসার শিহরণ জেগে ওঠে। সে ধীরে ধীরে পরমস্নেহে মেয়েটির কেশের ভেতর অঙ্গুলি সঞ্চালন ক'রলে। এমনি ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হ'লে ও মেয়েটির উত্তপ্ত ললাট নিজের একখানি হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রলে।

কোমলস্বরে প্রশ্ন ক'রলে, কেমন আছো গিউলিয়া ?

অতিকষ্টে গিউলিয়া ব'ল্লো, ভালো—অনেক ভালো।

গিগি নীরবে ওর মুখের প্রতি চেয়ে রইলো। একসময়ে মনে হলো, যেনো ওর দৃষ্টি গিউলিয়ার মনের অন্তর্দ্দেশে গিয়ে পৌছিয়েছে। সে ঐ ভাবেই চেয়ে ছিলো। কিন্তু বৃদ্ধার স্পর্শে সে চোখ ফিরিয়ে ওঁর দিকে চাইলো। তিনি ওর হাতে এক গেলাস জল দিলেন। ব'ল্লেন, ওষুধটা এখন ওকে কি খাইয়ে দেবে ?

গিগি নির্ব্বাক্যে মোড়ক থেকে একটা পাউডার তুলে নিয়ে সেটা জলের মধ্যে দিলে ফেলে। তারপর মেয়েটির মাথা পরমযত্নে নিজের হাত দিয়ে তুলে ওষুধটা—সেই কুইনাইনের প্রথম ডোজটা খাইয়ে দিলে।

গিগি বৃদ্ধাকে ব'ল্লো, জামাগুলো যদি ওর গা' থেকে খুলে নেওয়া যায়, তা হ'লে ও কিছুটা আরাম বোধ ক'রতে পারে।

—কিন্তু আমার মনে হয়, গিউলিয়া বড়ো দুর্ব্বল। এবং আমার পক্ষে একা সব দিকে যত্ন নেওয়া অসম্ভব। তুমি একটু সাহায্য করো না। ক'রবে ?

বৃদ্ধা, নিজের একখানা হাত গিউলিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিতেই, গিগি প্রবল ভাবে বাধা দিলো। ব'ল্লো, না না! তুমি এদিকে এসো। একটা কথা শোনো।

এই ব'লে গিগি গিউলিয়ার চোখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলো। দেখলো, সে দু'চোখ বুজে স্থির হ'য়ে পড়ে আছে।

* * * * * *

গিগি সিঁড়ির পথ ধরলো। ধ'রে নীচে নামতে লাগলো। বৃদ্ধা ওর পেছন-পেছন আসছিলেন। ও ব'ল্লো, দেখো, ঐ পাউডারের একটা, কি বড়োজোর দু'টো, দু'-ঘণ্টা অন্তর গিউলিয়াকে খাইয়ে দিও। কালকে বিকেলের আগেই, ওর জ্বর ছেড়ে যাবে। কিন্তু ওর যেনো ঠাণ্ডা না লাগে! সাবধান, ওর শরীর থেকে জামাটামা খুলো না!...

এই পর্য্যন্ত ব'লে গিগি মুহূর্ত্তমাত্র নীরব হ'য়ে রইলো। পরে খুব নিম্নস্বরে ব'ল্লে, তোমাদের দু'জনেরই এখান থেকে পালানো দরকার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বুঝলে, পালানো দরকার হ'য়ে উঠেছে।

শুনে বৃদ্ধা হতাশ হ'য়ে পড়লেন। ওঁর ক্ষুদ্র চক্ষু দু'টি অস্বাভাবিক ভাবে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো। সশঙ্কিত চিত্তে শুধু প্রশ্ন ক'রলেন, কেন,—কেন? কি হ'য়েছে বলো তো?

এক নিমিষের মধ্যে গিগি নিজের দেহটার চারিধারে চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর দাঁতে, দাঁতে চেপে নীচু গলায় তাড়াতাড়ি ব'ল্লো, আমাকে, টুনিনোকে, ষ্টিংঘেলাকে, বোলোরোসো এবং স্পুঘ্নাকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাঁশী,—হুইশিল—হুইশিল তুমি জানো? সে তিনবার বাঁশির শব্দ ক'রবে।

বৃদ্ধা কিছুই বুঝতে পারেন না। তাঁর মাথাটা কেমন যেনে গোলমাল হ'য়ে যেতে থাকে।

গিগি পুনশ্চ সুরু ক'রলো, তুমি অবশ্যই ওকে রক্ষে ক'রবে। এমন কি নিজের কাঁধে ক'রেও। হয়তো তখন ও দুর্ব্বলতার জন্যে চ'লতে পারবে না। কিন্তু তাই ব'লে তো ওকে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। পালাতে হবে, ওকে তোমাকে কাঁধে ক'রেও নিয়ে পালাতে হবে। এই নাও টাকা। প্রায় দু'শো লায়ার। এই দু'শো লায়ার গিউলিয়াকে সুস্থ এবং কর্ম্মঠ করবার পক্ষে যথেষ্ট—হ্যাঁ নিশ্চই যথেষ্ট। আমি চিরকাল কারাগারে থাকবো না। খালাশ পেয়ে আবার তোমায় খুঁজে বার ক'রবো। কারাগারে থাকা সত্ত্বেও আমি গিউলিয়ার সংবাদ রাখবো। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি জানতে

পারি তার কোনো কষ্ট হয়েছে, তবে তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে। বুঝতে পারছো, আমি কি ব'লছি ?

বৃদ্ধা ভয়ে ভয়ে উত্তর করেন, পেরেছি।

*

*   *

গিগি উত্তেজিত হ'য়ে ব'লতে লাগলো, গিউলিয়া যদি আমার কথা জানতে চায়, ব'লো—আমি কোনো রাজনৈতিক কারণ-বশতঃ কোথাও আটক হ'য়ে আছি। যদি দরকার ব'লে মনে করো—ওকে জানিও যে, ওরই জন্যে, ওকে সুখে রাখবার জন্যে আমাকে চুরি পর্য্যন্ত ক'রতে হয়েছে। কিন্তু আর একটা কথা! পুলিশ আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। মনে রেখো, তিনবার বাঁশীর আওয়াজ শুনলে গিউলিয়াকে নিয়ে পালাবে। এমন কি কাঁধে ক'রেও। যদি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাঁশীর শব্দ হয়, তাহ'লে বুঝবে—তোমাদের আশু কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই; কিন্তু আমি ধরা পড়েছি। কিন্তু আর নয়। আমার যাবার সময় হ'য়ে এলো। গিউলিয়াকে আমার বিদায় জানিও।

—কিন্তু তোমার কি ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে ?

গিগি কাঁধের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলে—হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন ?

এ-কথার প্রত্যুত্তরে গিগি নিজের গলাটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধ'রে যা' ইঙ্গিত করে, তাতে বৃদ্ধা নিরতিশয় ভীত হ'য়ে ওঠেন। এবং তৎক্ষণাৎ

ওঁর অজ্ঞাতসারে একটা বিকৃত-স্বর বাইরে আসে বেরিয়ে—খুন? গলা টিপে? শ্বাসরোধ ক'রে খুন?

গিগি ওঁর মুখে হাত চাপা দিয়ে ব'ল্লো, চুপ্। চীৎকার ক'রো না। মুখ ছেড়ে দিয়ে ব'ল্লো, আমি এ-পাপ নিজের হাতে ক'রি নি। প্রয়োজন হ'লে এ—আমি প্রমাণ ক'রতে পারবো। বোলোরোসোই আসল দোষী। সে আমাদের সকলের সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছে। যাক্, এ-সবের আর দরকার নেই।

গিগি ফিরে দাঁড়'লো। ওপরে উঠে এলো সিঁড়ি বেয়ে। সেই ক্ষুদ্র ঘরখানার মায়ায় তার মন আচ্ছন্ন।

* *

*

গিউলিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ ক'রছে এখন। ভাইয়ের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সহজ এবং কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলে, তুমি কি আজ থাকবে?

—না না। আমাকে এখুনি যেতে হবে। ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রছে।

—তুমি আবার আসবে?

—আ'সবো বৈকি! আজ রাত্রে না হোক, কাল সকালে তো বটেই। কিন্তু ঐ ওষুধ রেখে গেলাম! খেতে ভুলো না, বুঝলে?

—আচ্ছা।

একটা বিশ্রী নিস্তব্ধতা কিছুক্ষণ ধ'রে সেই ক্ষুদ্র ঘরখানাকে বেষ্টন ক'রে রইলো। কিন্তু সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রলো, গিগি। ভগ্নির মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ব'ল্লো, ধরো, আমি যদি না ফিরি। মানুষের বিপদের কথা তো বলা যায় না। এই ব'লে মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থেকে পুনর্ব্বার ব'ল্লে, কিন্তু আমি যেখানেই থাকি না কেন, তুমি কি ক'রছো, না ক'রছো—সবই আমি খবর রাখবো। তোমার খবর নিতে এক মুহূর্ত্তও আমার বিরাম থাকবে না। এ তুমি ঠিক জেনো।

গিউলিয়া বিচ্ছেদের আশঙ্কায় মুহ্যমান হ'য়ে প্রশ্ন করে, কেন—তুমি কি ফিরে আসতে চাও না ?

ভদ্রলোক সিক্ত কোটটি টেনে নিয়ে গায়ে দিলে।

টুপিটা মাথায় দিতে দিতে সে, প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ব'ল্লে, গিউলিয়া, চল্লাম।

একপ্রশ্ন, দু'বার জিজ্ঞাসা করা, গিউলিয়ার অনেক দিন থেকেই স্বভাবের বাইরে। সে আর কোনো প্রশ্ন ক'রলো না। কথাও ব'ল্লো না। শুধু গিগিকে আলিঙ্গন ক'রবার জন্যে একবার নিজের ক্ষীণ হাতটা ওর দিকেই বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু গিগি সেদিকে লক্ষ্য ক'রলো না। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে চ'লে এলো।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়! গিগি সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে হঠাৎ কী মনে ক'রে আবার ঘরে ফিরে এলো। গিউলিয়ার অশ্রুধৌত শীর্ণ মুখখানির দিকে চেয়ে ব'ল্লো, গিউলিয়া, ভুলোনা। ওষুধ খেও। বৃদ্ধার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ইঙ্গিতে সাবধান ক'রে দিয়ে অন্য কোনো

দিকে লক্ষ্য ক'রলো না। শুধু লক্ষ্য রইলো, সোপান-শ্রেণীর দিকে।

—দুই—

বোলোরোসোর জীবনের একটা ইতিহাস আছে :—

পুলিশ অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করা সত্ত্বেও ওকে ধ'রতে পারলে না। ওরা এক রকম হাল দিয়েছিলো ছেড়ে। বোলোরোসোর মতো একটা সুচতুর দুর্ব্বৃত্তকে ধরা, তাদের পক্ষে অসম্ভব ব'লেই ওরা মেনে নিলে। এমনি যখন তাদের সিদ্ধান্ত, তখন একদা সন্ধ্যাবেলা একটা পকেটমারকে ধ'রে বোলোরোসো বিজয়গর্ব্বে সেই অঞ্চলের নামজাদা ইষ্টিশানে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু এই পকেটমার ধরাই তার 'কাল'। এটা ওর জীবনে একটা মহাভ্রান্তির মত্তিময়ী বিভীষিকা। পুলিশ ইন্সপেক্টর সৌভাগ্যক্রমে সে-সময়ে সেই জায়গায় ডিউটী দিচ্ছিলেন। সে সানন্দ সঙ্গের প্রসিদ্ধ দুর্ব্বৃত্ত বোলোরোসোকে দেখতে পেলে। এটা আশাতিরিক্ত। ওর বিস্ময়েরও সীমা হারিয়ে গেলো। একটা চোরকে ধ'রেছে, আর একটা ডাকাত, খুনে, বদমায়েস! বড়ো হাসির ব্যাপার—নয় কি ?

এই ছিঁচকে চোরটা একজন সওদাগরের পকেট থেকে সোনার হার তুলে নেয়। ভদ্রলোক তখন পার্কে দাঁড়িয়ে সঙ্গীত শুনছিলেন নিবিষ্ট চিত্তে। বোলোরোসো এটা দেখতে পায়। একটা তামাসা

করার অভিসন্ধিতে সে লোকটাকে ধ'রে ফেলে। কিন্তু সেই তামাসা করাটা, ওর জীবনে সাংঘাতিক হ'য়ে দাঁড়ালো। ইন্সপেক্টর তাকে ছাড়বে কেন? দু'-জনকেই ক'রলেন গ্রেপ্তার। কিন্তু বোলোরোসো ওকে বোঝাতে চাইলো—এটা তার সৎকাজ। তার জীবন পরিবর্ত্তনের একটা উজ্জ্বল পন্থাও বটে। পুলিশের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে প্রতিদিন দশটা চোর ধ'রে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে চাইলো :

কিন্তু ইন্সপেক্টর সাহেব নিরুত্তরে শুধু একটু হাসলো।

বোলোরোসো কারাগারে প্রেরিত হ'লো।

*　　*　　*　　*　　*

কিন্তু বোলোরোসোদের দলকে সানন্দ সঙ্ঘ নামে অভিহিত করারও কারণ আছে। এই সঙ্ঘের একমাত্র উদ্দেশ্য আনন্দপ্রিয়তা। বোলোরোসো সহচরদের সততই আনন্দ বিতরণ ক'রতো। সে যেনো তার সাথীদের উৎস, প্রেরণা এবং আনন্দের ঝর্ণা। জীবনকে ওরা রঙিন দেখতো। জীবনকে গলাটিপে মারতে কখনো চাইতো না। পথচলা পথিকদের অযথা লাঞ্ছনা ক'রতো। মনিকারের দোকানের কাচ ভেঙ্গে দিতো, ইত্যাদি কতো কি! ওরা এই সব অযথা উপদ্রব ক'রতো নিজেদের জীবনকে আনন্দের আলোকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলবার জন্যে। এ-ছাড়া দ্বিতীয় অভিসন্ধি ওদের মনে স্থান পেতো না। অন্ততঃ, মনে তো হয় না।

কিন্তু পরের ক্ষতি ক'রে নিজেদের মনে আনন্দের খোরাক যোগাতে গেলে সব ক্ষেত্রেই যে, নিরাপদ হওয়া যায়, তা' নয়।

বিপদ আসে। আসা স্বাভাবিক। এবং স্বাভাবিক ব'লেই সানন্দ সঙ্গের সাথীরা, বিধাতার অভিশাপ অজ্ঞাতসারে আহরণ ক'রে নিলে।

কিন্তু কী ক'রে আহরণ ক'রলো, সে কথাই ব'লছি :—

কার্লো মেটিরোটি ঔষধ বিক্রেতা। লোকটার পয়সা আছে প্রচুর; অসম্ভব কৃপণ। পোষাকের মধ্যে একখানা কম্বল। আহার যা' করে, তা' সামান্য। পয়সা খরচের ভয়ে, রাত্রে তার ঘর অন্ধকার। ওর জীবনে না ছিলো আনন্দ, না ছিলো ভালোবাসা। ভয় আর সন্দেহ এক মুহূর্তের জন্যেও তার মন ছাড়া হতো না। একদিন রাত্রিকালে বোলোরোসো, গিগি এবং ষ্টিংঘেলা ওর বাড়ীর দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে সমস্ত লুঠ ক'রে নিলে। ফেরবার সময় বোলোরোসোর মনে একটা নতুন অভিসন্ধি আশ্রয় ক'রলো। সেই অভিসন্ধিটা—বাড়ীর কর্তার সঙ্গে একবার দেখা করা। প্রজ্জ্বলিত বাতি হাতে নিয়ে কার্লো-মেটিরোটির শয়ন কক্ষে ওরা প্রবেশ ক'রলো।

বাড়ীর কর্তা হাঁ ক'রে গভীর নিদ্রা যাচ্ছিলো। লোকটার দন্তহীন কাদর্য্য মুখখানা দেখে বোলোরোসোর প্রাণটা আর একটা নতুন কৌতুক করার লোভে নেচে উঠলো। এদিক-ওদিক্ খুঁজে কোনো জিনিষই ওর দৃষ্টিগোচর হ'লো না। ঐ দন্তশূন্য শ্রীহীন হাঁ-করা মুখখানা বুজিয়ে দেবার মতলবে, সে হাতের বাতিটাই কার্লো মেটিরোটির মুখের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করিয়ে দিলে। লোকটা বিদ্যুৎস্পর্শিতের মতো শয্যার ওপর উঠে ব'সলো। এবং পরক্ষণেই বাতিটা অদন্ত মাড়ি দিয়ে, কামড়ে ধ'রলো। কিন্তু নিমিষের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা ওর কাছে জলের মতো পরিষ্কার হ'য়ে উঠলো। ভয়ে চীৎকার ক'রে

লোক ডাকবার চেষ্টা ক'রতেই, বোলোরোসো তার অভিসন্ধি ধ'রে ফেল্লে। কিন্তু তারপর ? তারপর এক মুহূর্ত্তেই সব শেষ। এক দিকে হাতের বাতি নির্ব্বাপিত। অন্যদিকে কার্লো মেটিরোটির জীবনাবসান। খেলাচ্ছলে এতো বড়ো একটা দুর্ঘটনা বোধকরি পৃথিবীতে আর ঘটেনি।

* *

*

কিন্তু এই আকস্মিক দুর্ঘটনা গিগির মনে একটা অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন এনে দিলে। দলের থেকে ও ছাড়া হ'য়ে রইলো। প্রচার ক'রে দিলে—ইলেক্‌ট্রিকের কাজ একটা কোম্পানীতে নিয়েছে।

কিন্তু সেই কোম্পানীর অস্থিত্ব আছে ব'লে মনে হয় না।

ওর সঙ্গীরা ওকে দলছাড়া ক'রতে চায় না। ওরা বলে, তুমি আমাদের দলে থেকে সামান্য-সামান্য কাজ করো। এবং তা' থেকে নিজের জন্যে সামান্য কিছু নাও। গিগি এ-কথায় রাজী না হ'য়ে পারেনি। যে-কাজে কম ঝক্কি, সেই কাজের মধ্যে থেকে গিউলিয়ার জন্যে অর্থ পাওয়া, তার বড়ো বেশী প্রয়োজন। গিগি আজকাল অস্বাভাবিক গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। মাঝে-মাঝে তার মনটা কোথায় যেনো ভেসে চ'লে যায়। গিউলিয়া, ওর ভগ্নি গিউলিয়া, বাইরে কাজ ক'রে, মানে দর্জ্জির কাজ ক'রে—মন্দ উপার্জ্জন ক'রতো না। কিন্তু হঠাৎ একদিন গিগির চোখে প'ড়লো গিউলিয়ার যৌবন উঠেছে উথলিয়ে। নদীতে বান্ ডাক্‌লে নদীর দু'-কূল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। গিগি অন্ধের মতো ভালোবাসতো তাকে। ওর দেহের

উচ্ছ্বসিত যৌবন দেখে, তার আশঙ্কা হ'লো। চিন্তা হ'লো—ওর যদি এ-রকম পথে-ঘাটে যাওয়া-আসা বন্ধ করা না যায়, তা'হ'লে হয়তো ওর চরিত্র ঠিক্ থাকবে না।

গিউলিয়ার পথে বেরোনো বন্ধ হ'লো।

*   *   *   *   *

কি একটা কারণে, গিগি প্রথম জেলে গেলে, পুলিশ তার বাড়ীতে মধ্যে-মধ্যে অতর্কিতে হানা দিতো। উদ্দেশ্য—গিউলিয়ার জীবন ধারণের পন্থা জ্ঞাত হওয়া। কিন্তু পুলিশ সন্দেহজনক কিছু পেলে না। গিউলিয়াকে সংভাবে জীবন যাপন ক'রতে দেখে, তারা তাকে আর বিরক্ত করা সমীচীন ব'লে মনে ক'রলো না।

কারাগার থেকে মুক্তি পাবার কিছু দিন পরেই ঐ কৃপণ হত্যা কাণ্ড ঘটে। গিগির এতে ভাগ ছিলো। অর্থ নিয়ে সে অসুস্থ ভগ্নিকে দেখতে এসেছিলো। টাকা না হ'লে, ওর চিকিৎসাই বা কী ক'রে সম্ভব হবে ?

*   *   *   *   *

দেড় বছর পরে—হ্যাঁ, ঠিক্ দেড় বছর পরে, সানন্দ-সঙ্গীদের বিচার ব'সেছে আদালতে—বিচারকের সম্মুখে। আদালতে বিপুল জন-সমাগম। এদের বিচার একটা মস্ত আলোচনার বস্তু। মিলানের জন-সাধারণের অনুরাগ যেনো একত্রীভূত হ'য়ে কৌতূহলে চেয়ে আছে বিচারকের পানে।

সানন্দ সঙ্গ

পাঁচটি দুর্ব্বৃত্তের উগ্র এবং ভীতিপ্রদ চেহারা, সমবেত জন-মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে পারে না। গিগি ওরফে পিভিয়নের দীর্ঘ এবং ক্ষীণ দেহ, ওর দু'টি উজ্জ্বল চক্ষু সর্ব্বাগ্রে সকলের চোখে পড়ে। বোলোরোসো ওরই দক্ষিণভাগে দাঁড়িয়ে। এর দেহ খর্ব্ব এবং চোখ দু'টি লাল, রক্তবর্ণ। সে তার চারিপাশে কেবল দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখছিলো।

বোলোরোসো বিচারককে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লে, মাননীয় বিচারপতি মশাই, আপনাকে মনে করিয়ে দিতে আদেশ হোক যে, আমি একটা চোরকে ধ'রে দিয়েছি।

ওর এবম্বিধ উক্তিতে আদালতের দর্শকরা সকলেই প্রায় একসঙ্গে উচ্চ-হাস্য ক'রে উঠলো। কিন্তু এতে বোলোরোসো লেশমাত্রও লজ্জিত হ'লো না। বরঞ্চ ও যেনো প্রচুর আনন্দোপভোগ ক'রলে। জনতার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে অত্যন্ত উঁচুগলায় ব'ল্লে, এর দরকার নেই, দরকার নেই। জনতার আমি বড়ো প্রিয়। এই ব'লে সে পার্শ্বোপবিষ্ট স্পুঘ্‌নাকে একটা ধাক্কা দিয়ে ব'ল্লে, দেখছিস্, আমার আকর্ষণের ক্ষমতা!

শুনে স্পুঘ্‌না হেসে ফেল্লে। বয়েস ওর বেশী নয়। সবে চব্বিশে পড়েছে। ওর কানের ধার ঘেঁসে চিবুক পর্য্যন্ত একটা কালো বিশ্রী দাগ। বিনা চেষ্টায় ওটা নজরে পড়ে। এর জন্যে ওর মুখের চেহারাটা একেবারে বদলে গেছে। নইলে, মুখখানা দেখতে ভালোই হ'তো। ওর মনে ভয়ের লেশমাত্রও খুঁজে পাওয়া যায় না। ও জানে, হত্যা সম্বন্ধে ওর কোনো সংস্পর্শ নেই। ওর ধারণা—ওকে

অপরাধী হিসেবে এখানে আনা হ'য়েছে শুধু হায়রাণ করবার জন্যে। ব'লে, হত্যার সঙ্গে এ-সবের কী করবার আছে? সে রাত্রে আমি—

স্পুঘ্নার ঠিক পরেই দাঁড়িয়ে ছিলো—ষ্ট্রিংঘেলা। সে বোলোরোসো এবং গিগির অপরাধে, অপরাধী। বোলোরোসো আর গিগি হত্যা সম্পর্কে ধৃত।

স্পুঘ্নার কথায় ষ্ট্রিংঘেলা হঠাৎ ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে; স্পুঘ্নার পাঁজর-দেশে নিজের কনুইয়ের সাহায্যে এমন একটা আঘাত ক'রে বসে যে, তাতে স্পুঘ্না বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশ্বাস নিতে পারে না।

পঞ্চম আসামী—এন্‌টনিয়ো ষ্টুকি। ওর মুখ দেখে কারো বোঝবার উপায় নেই যে, ও ডাকাতীর এবং হত্যার মামলার অপরাধী। মুখে একটা আনন্দের হাসি, সব সময়েই লেগে রয়েছে। ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে বসবার ভঙ্গি দেখে, আর মাঝে-মাঝে বিচারপতির বক্তৃতায় ঘন-ঘন মাথা নাড়ার রকম দেখে মনে করবার কোনো উপায় নেই যে, ও এই মামলার আসামী। অন্যান্য দর্শকের মতো সেও যে একজন—এই ভাবটাই ওর মনে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে।

পিভিয়নের স্বপেক্ষ কোনো জোরালো প্রমাণ নেই যাতে ক'রে ও মেটিরোটির হত্যার সহকারী ছিলো না ব'লে, নিজেকে বাঁচাতে পারে। বিচারপতি যখন ওকে জেরা ক'রছিলেন, তখন তার চোখ দু'টি একটা পরিচিত মুখকে সেই বিশাল জনতার মধ্যে আবিষ্কার ক'রতে ব্যস্ত ছিলো। বিচারপতি সাক্ষীর মারফৎ জানতে পারলেন, পিভিয়নের ভগ্নি আছে। তিনি সেই ভগ্নিসহ ওকে না দেখতে পেয়ে, নিতান্তই বিস্মিত হ'লেন।

বিচারপতি পিভিয়নকে প্রশ্ন ক'রলেন :—

—তোমার ভগ্নি করে কি ?

—কাজ করে। এই ব'লে পিভিয়ন পায়ের ওপর ভর দিয়ে একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে উঠলো। মনে হ'লো, বুঝি কয়েদীর খাঁচার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।

—ওঃ কাজ করে ? কিন্তু কাজটা কী শুনি ? তোমার ব্যবসা অনুসরণ ক'রে—না ?

—সে দর্জ্জির কাজ করে। ওর জীবন যাত্রার মধ্যে কোনো অসৎ-উদ্দেশ্য নেই।

—তুমি ওর সঙ্গেই থাকো ?

—হ্যাঁ, মশাই।

—তুমি যে-কাজ করেছো, সে-সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা আছে ? মানে, তুমি যে চুরি, হত্যা, ডাকাতী ক'রে থাকো, তা' ও জানে ?

—না, মশাই। সে জানে, আমি একজন বিদ্যুৎ-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

—কিন্তু এতোদিন তুমি তাকে ঠকিয়ে এসেছো ? বার তিনেক তোমার ভাগ্যে কারাবাস ঘটেছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছি, তুমি কী ভাবে এই সত্যিটা তার কাছে গোপন ক'রে রাখতে পেরেছো—হ্যাঁ ?

এন্‌টনিয়ো ষ্টুকি, সহচরের মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তার মাথায় আসছিলো না যে কী ভাবে ও, মানে পিভিয়ন, এই জেরার প্রত্যুত্তর দেবে।

পিভিয়ন উত্তর দেয়, প্রথমবারে তাকে আমি জানিয়েছিলাম, রাজনৈতিক কারণ-বশতঃ আমার জেল হ'য়েছে।

এ-কথা শুনে জনতা উচ্চ-হাস্য ক'রে উঠলো।

—দ্বিতীয়বারে ব'লে ছিলাম, কাজের জন্যে বিদেশে যাচ্ছি। তৃতীয়বারে ওকে আবার রাজনৈতিক কারণের ওজুহাত দিয়ে ছিলাম।

—তোমার ভগ্নি সব সময়েই তোমায় বিশ্বাস করে ?

—সব সময়েই।

—তা' হ'লে ব'লতে হবে, সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। কিন্তু, এ-সব আমার কাছে এখনো পরিষ্কার হচ্ছে না। আচ্ছা, তুমি ব'সো।

গিগি জনতার ওপর দিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে ধীরে ধীরে উপবেশন করে।

তখন বিচারপতি পোর্টাগারিবাল্ডির অঞ্চলের অধিবাসী একজন সাক্ষীকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তুমি তাকে জানো ?

—মাননীয় বিচারপতি মশাই, আমি তাকে চিনি।

—সে কি করে বলো তো ?

—এক সময়ে সে কাজ ক'রতো বটে। কিন্তু সেতো অনেক আগে। তখন পিভিয়ন হত্যার অপরাধে ধরা পড়ে নি।

এই সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটলো। বোলোরোসো জনতার একদিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ ক'রে লাফিয়ে উঠলো—দেখুন-দেখুন-দেখুন।

বিচারপতি অপ্রসন্নচিত্তে প্রশ্ন ক'রলেন, কেন, কী হ'য়েছে ? বোলোরোসো উত্তর ক'রলে, মহামান্য বিচারপতি মশাই, ঐ দর্শকদের মধ্যে সেই চোরটাকে দেখতে পাচ্ছি। ঐ—ঐখানে ও দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁত খিঁচোচ্ছে। আমার বেশ মনে প'ড়ছে, ঐ লক্ষ্মীছাড়া চোরটাকে প্রায় বছর দুই আগে পাকড়াও ক'রে ছিলাম।

বোলোরোসো একটু নীরব থেকে আবার ব'ল্লো, বিচারপতি মশাই. ঐ চোরটা আমার সঙ্গে মনে হচ্ছে দেখা ক'রতে এসে ছিলো। আমি আগেই ভালো ভাবে জীবন যাপন ক'রতে সুরু ক'রে ছিলাম। আমি চোর ধ'রেছি·········

জজসাহেব নিতান্তই বিরক্তি প্রকাশ ক'রে চীৎকার ক'রলেন, দেখো, তুমি যদি বক্তৃতা বন্ধ না করো, তোমায় কয়েদ-কক্ষে আবার পাঠাবো—বুঝলে ?

বোলোরোসো এবার উপবেশন ক'রলো ।

কিন্তু পিভিওনের কানে ফিস্-ফিস্ ক'রে ব'ল্লো, ঠিক সেই লোকটা। বহুদিন পর ওর চেহারা দেখে আমি সত্যি বড়ো খুশী হয়েছি ।

কিন্তু ও বোলোরোসোর কথার প্রত্যুত্তর ক'রলো না। শুধু সুমুখের দিকে একটু ঝুঁকে সাক্ষীর কথা শুনতে লাগলো।

বিচারপতি আবার সাক্ষীকে ব'ল্লেন :—

—তখন সে কাজ ক'রতো। কাজ করা ওর অভ্যাস ছিলো। কিন্তু এখন, এখন সে কি করে ?

সাক্ষী গিগির মুখপানে দৃষ্টিপাত ক'রে ইতস্ততঃ ক'রতে লাগলো। ব'ল্লো, মহামান্য বিচারপতি বাহাদুর, আমি ঠিক্ বুঝে উঠতে পারছিনে. আমার এ-সব বলা উচিত কিনা ।

—কিন্তু তোমায় ব'লতেই হবে। সত্যকে তুমি ভয় করো?

—আচ্ছা, বিচারপতি বাহাদুর! যখন আপনি আদেশ ক'রছেন, তখন আমি প্রকাশ ক'রতে বাধ্য! তা' আমি ব'লতে চাই যে, গিউলিয়ার ভাই পিভিয়ন, ধরা পড়বার পর থেকে গিউলিয়া, কাজে ইস্তফা দিয়েছে। একজন অবস্থাপন্ন লোকের সঙ্গে খুব সাজগোজ ক'রে গিউলিয়াকে থিয়েটারে যেতে আমি দেখেছি। একদিন নয়, দু-দিন নয়—প্রায় প্রতিদিন।

—হুঁ-বুঝতে পেরেছি। কিন্তু যতো দিন পর্য্যন্ত এই কয়েদী ধরা পড়েনি, ততো দিন পর্য্যন্ত কি গিউলিয়া নিজের স্বভাব ভালো রেখে ছিলো?

—ও নিশ্চয়ই। সে তখন দর্জ্জির কাজ ক'রে অনেক টাকা উপায় ক'রতো। ওর ভাই ওকে বড়ো ভালোবাসতো। সেও ভাইকে সম্মানের চক্ষে দেখতো। কিন্তু ঠিক্ ব'লতে পারছিনে, গিউলিয়া সত্যি ভাইকে ভালোবাসতো, কি ভয় ক'রে চ'লতো। ওরা বহুদিন পোর্টাগারিবল্ডির কাছা-কাছি ছিলো। তারপর হঠাৎ একদিন হ'য়ে গেলো অদৃশ্য।

বিচারপতি বাধা দিয়ে ব'ল্লেন, সবুর করো। তারপর গিগিকে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লেন, তুমি হঠাৎ অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিলে কেন?

কিন্তু গিগি সে-প্রশ্নে কর্ণপাত না ক'রে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো। এন্‌টনিয়ো ঝুঁকি চুপি-চুপি ব'ল্লো, গাধা কোথাকার, উত্তর দে' না?

তাড়াখেয়ে পিভিয়ন উঁচু গলায় ব'লে উঠলো, না—না এ' কখনো

সত্যি হ'তে পারে না। আমার বোন সাজগোজ ক'রে থিয়েটার দেখতে যাবে? অসম্ভব, অসম্ভব—এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। সাক্ষী ওর নামে মিথ্যাপবাদ দিচ্ছে।

বিচারপতি উগ্রভাবে ব'ল্লেন, তোমার বাজে কথা শোনবার জন্যে আদালত তৈরী হয় নি। আমি জানতে চাই—পোর্টাগারিবল্ডি ছেড়ে চ'লে আসবার পর, তুমি কী ভাবে জীবন যাপন ক'রতে? তোমার ভগ্নিকে নিয়ে সহসা তুমি অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছিলে কিসের জন্যে?

পিভিয়ন ব'ল্লো, কারণ আমি গুটিকতোক ছেলেকে তার জানালার নীচে দিয়ে প্রায় আসা-যাওয়া ক'রতে দেখেছিলাম। তারা চেষ্টা ক'রতো– আমার বোনের সুনজরে পড়্‌তে।

—তোমার উদ্দেশ্য কি ঐ ছিলো? আর কিছু ছিলো না?

গিগি অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে ব'ল্লো, তারা ওকে দেখতে পায়, এ আমি চাইতাম না। ওর প্রণয়ী জুটবে, এও আমি চাইনি। তার জীবন নষ্ট হ'তে দিতে আমার কোনোকালেই ইচ্ছে ছিলো না।

বিচারপতি তাঁর দক্ষিণভাগে উপবিষ্ট একজন জুরীকে লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লেন, এ-সমস্তই অদ্ভুত ঠেকছে। তারপর তিনি গিগির দিকে চাইলেন। ব'ল্লেন, ঐ কারণে তুমি তাকে শহর থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলে ছিলে?

—হ্যাঁ, পোটারোমনা থেকে প্রায় মাইলটাক দূরে। এখানে সে কারোর মুখ দেখতে পেতো না।

—কিন্তু তুমি পেট চালাতে কি ক'রে?

—সে কাজ বন্ধ করেনি, যদিও সে উপার্জ্জন ক'রতো অল্প। এবং আমি—

বিচারপতি বাধা দিয়ে ব'লেন, তুমি চুরি ক'রতেই লাগলে? তুমি কি ভেবেছিলে যে, তোমার ঐ অসং-দৃষ্টান্তে তোমার ভগ্নি সং-জীবন যাপন ক'রতো ?

—সে জানতো না। আমি যা ব'লতাম, সবই সে বিশ্বাস ক'রতো। উপরন্তু আমার জীবনের চলবার ধারা পরিবর্ত্তন করবার দৃঢ়সঙ্কল্প ক'রে ছিলাম। কিন্তু একদিন দুর্ভাগ্যক্রমে বোলোরোসোর সঙ্গে দেখা হ'তেই, আমার সে-সঙ্কল্প বাতাসের সঙ্গে ভেসে গেলো। সে সময় আমার ভগ্নি পীড়িত। সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত। তার চিকিৎসা করবার মতো এক পয়সাও আমার পকেটে ছিলো না। আমি টাকা পেয়েই ভগ্নির জন্যে, আমার ভগ্নির জন্যে, ওষুধ কিনে নিয়ে গিয়ে ছিলাম।

—গিউলিয়া তোমার কুকীর্ত্তি জানতো না ?

—না।

বিচারপতি সাক্ষীকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্লেন, তুমি কি বিশ্বাস করো, মেয়েটি তার ভাইয়ের কীর্ত্তি কিছুই জানতো না ?

—মাননীয় বিচারপতি মশাই, আমি নিঃসন্দেহ। সে তার ভাইকে কখনো অবিশ্বাস ক'রতো না।

—না, এ-সব আমার কাছে এখনো পরিষ্কার হ'লো না।

সেদিনের মতো মামলা মুলতুবী রইলো।

পরদিন গিউলিয়ার নামে আদালত থেকে শমন ধরানো হ'লো।

—তিন—

সংবাদপত্রের উপদ্রব অনেকেরই জানা আছে। পরদিন প্রভাত বেলায় সংবাদপত্র গুলি গিগির গতকালকের আদালতে উপস্থিতিকে অবলম্বন ক'রে, নানা রকম মিথ্যে কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিলো। এরা সবাই একবাক্যে গাইলো, আদালতে বিচারকালীন গিগি তার ভগ্নির সম্বন্ধে সাক্ষীর মারফৎ যে-সব কথা শুনেছিলো, তাতে তার ঘনঘন ফিট্ না হ'য়ে যায়নি। এবং বারদুই সে আত্মহত্যারও উপক্রম ক'রে ছিলো। শুধু এই নয়। কয়েকটি সখের সাংবাদিক দুরভিসন্ধিবশে শ্রমস্বীকার ক'রেও, গিউলিয়ার মাসীকে খুঁজে বার ক'রলো! কিন্তু বার ক'রেই তারা ক্ষান্ত হলোনা। সত্যি-মিথ্যেতে সমস্ত কাহিনীটা তাঁকে জানিয়ে দিলো। শুনে বৃদ্ধা তাঁর বোনপো এবং গিউলিয়ার পক্ষাবলম্বন ক'রে অনেক কথাই ব'লে গেলেন।

সাংবাদিকরা জেনে গেলো—গিউলিয়া, গিগির ধরা পড়বার পর থেকে, একটি অবস্থাপন্ন ছেলের বাগ্‌দত্তা হ'য়ে আছে।

তারপর? তারপর গিউলিয়ার প্রতিকৃতি দৈনিক কাগজে ছাপা হলো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গিউলিয়া হঠাৎ বিখ্যাত হ'য়ে উঠলো।

*　　*　　*　　*　　*

আজ গিউলিয়ার আদালতে হাজির হবার দিন। এই সংবাদটা পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হয়। মিলানের জনতা যেনো একযোগে আদালতে

ভেঙে পড়লো। আদালত-গৃহ আজ লোকে লোকারণ্য। কোথাও তিলমাত্র স্থান খালি নেই।

যথাসময়েই গিউলিয়া ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ ক'রলো। তার দেহে কালো পোষাক। মাথার টুপির ওপর দিয়ে একটা ওড়না নেমে এসেছে ওর কাঁধে। কিন্তু সেই ওড়নার মধ্য দিয়েও ওর দু'টি হরিণীর মতো চোখ দেখা যায়।

বিচারপতি ওর মুখপানে ক্ষণকাল তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ব'ল্লেন, তোমার নাম গিউলিয়া ক্যাভেলিয়ারী? তোমার বয়েস মাত্র উনিশ বছর? তুমি গিগি বা পিভিয়নের ভগ্নি - কেমন? আচ্ছা, এই বার ব'সতে পারো।

কিন্তু গিউলিয়া লজ্জার সঙ্গে জজসাহেবের আদেশ মান্য ক'রতে গিয়ে সারা বিচার-কক্ষটায় একটা হাসির তুফান বইয়ে দিলো। ওর পেছনে একখানা চেয়ার পাতা। ও জানতো না যে, ওখানা নিজের জায়গাটা আঠার মতো দখল ক'রে আছে। চেয়ারটা ছিলো পেরেক দিয়ে মারা। গিউলিয়া জুরীর দিকে পেছন ক'রে উপবেশন করবার অভিপ্রায়ে চেয়ারখানাকে হাত দিয়ে সরিয়ে নেবার প্রয়াস ক'রতে গিয়েই এই বিভ্রাট। আদালত-কক্ষের একযোগে—বিদ্রূপ-হাস্য গিউলিয়াকে শুধু ভীত ক'রলো না। তার আপাদমস্তক পর্য্যন্ত লজ্জার এবং অপ্রতিভের আতিশয্যে শিহরিয়ে উঠলো।

কিছুক্ষণ পর বিচারপতি গিউলিয়াকে প্রশ্ন ক'রলেন, এই আসামী তোমার ভাই? তুমি জানো ও কি দোষে দোষী সাব্যস্ত হ'য়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে?

গিউলিয়া ঈষৎ ঘাড় নেড়ে জানালো যে সে তা' জানে। বিচারপতি পুনরায় ব'ল্লেন, তোমার ভাই,—চুরি, ডাকাতী নির্য্যাতনের আসামী। এবং হত্যাকার্য্যে সহকারী—আসামী। এই সকল দোষে সে দোষী! আমি যা' ব'লছি, সত্যি নয়?

এই পর্য্যন্ত ব'লে তিনি চুপ ক'রলেন। কিন্তু সেটা মুহূর্ত্তের জন্যে। পুনর্ব্বার ব'ল্লেন, কিন্তু তুমি কী ক'রে সে সব জানতে পারলে? কে তোমাকে জানালো?

গিউলিয়া এর উত্তরে ফিস্-ফিস্ ক'রে কি যেনো উচ্চারণ ক'রলো, ভালো শোনা গেলো না।

জজসাহেব ব'ল্লেন, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। জোরে বলো, যা' তোমার বক্তব্য আছে।

—মাসার কাছ থেকে আমি সমস্তই শুনেছি। তা' ছাড়া সংবাদ পত্রেও আমি পড়েছি। গিগি কখনো আমাকে বিশ্বাস করে নি।

বিচারপতি সাহেব গিউলিয়ার এই কথায় কয়েক মুহূর্ত্ত ওর মুখ পানে উৎসুক এবং নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। মিথ্যে বা প্রবঞ্চনার কোনো ছাপ্ ওর মুখে পড়ে কিনা সেটা জানাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু উনি এর কিছুই সেই সুন্দর মুখখানার কোথাও খুঁজে পেলেন না। ব'ল্লেন, এটা কি সত্যি—গিগি আর তোমার মধ্যে একটা প্রগাঢ় ভালোবাসা বহে যেতো এবং ঐ গিগি, বাঘ যেমন তার শাবকদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, ঠিক্ তেমনি ধারা তোমার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলো? কেমন, সত্যি—না?

জজসাহেবের এবম্বিধ জেরায় গিউলিয়ার সমগ্র মুখমণ্ডল পলকের মধ্যেই রাঙা হ'য়ে উঠলো। কী যেনো বলবার জন্যে তার প্রাণটা অস্থির হ'য়ে উঠছিলো। কিন্তু শত চেষ্টা ক'রে একটা কথাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ ক'রতে পারলো না।

বিচারপতি পুনরায় ব'ল্লেন, গিগি তোমাকে সর্ব্বদাই আগলে থাকতো পাছে তুমি অন্যের কুনজরে পড়ো। এবং ওর নিজের মুখ থেকে যতোদূর পর্যান্ত শোনা গিয়েছে তাতে ক'রে মীমাংসা ক'রতে দেরী হবে না যে, তুমি ওর ভগ্নি নও—প্রেমিকা। তোমার এমনি সুশ্রী চেহারা। তোমার মুখ সারল্যে পরিপূর্ণ। কাজেই সকলের মন সহজেই ব'লতে চাইবে—গিগির মতো বিশ্রী চেহারার খুনীর ভগ্নি তুমি কী ক'রে হ'তে পারো? না না—এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তুমি কখনো গিগির ভগ্নি হ'তে পারো না।

বিচারপতির এই বিশ্রী মন্তব্যে গিগির উকিল তীব্র প্রতিবাদ ক'রলেন। জজসাহেবের উত্তর দেবার পূর্ব্বেই আদালতের উকিল এমন কতোকগুলি বিশ্রী ইঙ্গিত ওঁকে, মানে গিগির উকিলকে ক'রে ব'সলেন, যে সেই নিয়ে উভয়ের মধ্যে একটা বচসার সৃষ্টি হ'লো। বোলোরোসো এতক্ষণ নীরবে, নিস্তব্ধে ব'সে ছিলো। কিন্তু আর সে পারলে না। হাস্য-বেগ দমন ক'রতে গিয়ে ওর মুখ দিয়ে একটা অব্যক্ত এবং অদ্ভুত শব্দ বাইরে বেরিয়ে এলো। সমগ্র বিচার কক্ষটাই যেনো ওর দিকে ফিরে দৃষ্টিপাত ক'রলো। এবং এতে জজসাহেব পরম ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন। তিনি প্রথমে ভয় দেখালেন, বিচার মুলতুবী রাখবেন। পরে বোলোরোসোকে জানালেন—ওঁকে

অন্ধকার কারাগারে এখুনি পাঠাবেন। কিন্তু ভয় দেখানোই সার। পরিশেষে গিউলিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলেন। ব'ল্লেন, আদালতের আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার নেই। তুমি এখন যেতে পারো।

গিউলিয়া ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে দৃষ্টিপাত ক'রলো সেই পঞ্চবন্দী খাঁচাটার দিকে। ওর ভাই খাঁচার গরাদ ধ'রে ব'সে। গিউলিয়া ওর দিকে অগ্রসর হ'য়ে গেলো। আস্তে আস্তে তার হাত প্রসারিত ক'রে দিলে গিগির পানে।

কিন্তু আশ্চর্য্য! গিগি ক্রোধান্ধ হ'য়ে চীৎকার ক'রে ওঠে, দূর হ'য়ে যাও। আমার সুমুখ থেকে শীগ্যির যাও সরে। নইলে, গলা টিপে তোমার জীবন শেষ ক'রে দোবো।

ব'লতে ব'লতে ও দাতে দাঁত চেপে নিজের হাত দু'টো সত্যিই গিউলিয়ার কণ্ঠ লক্ষ্য ক'রে খাঁচার লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে বার ক'রে দিলে।

এই অশোভন ঘটনায় বিচারকক্ষের প্রতি জানালাটা পর্য্যন্ত জনসাধারণের গালি-গালাজে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো। এর ফলে চক্ষের নিমিষে দেখা গেলো—খাঁচার মধ্যে সকলেই, সেই পাচটি কয়েদী, বিদ্যুৎচালিতের মতো সহসা উঠে দাড়ালো। ওদের মুখ-চোখ দিয়ে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসছে। চেহারা হিংস্র শ্বাপদের চেয়ে ও ভীষণতর। সেই পাঁচটি কয়েদী একসঙ্গে লোহার খাঁচার গায়ে প্রবল-বিক্রমে আঘাত ক'রতে লাগলো। মনে হ'লো, এখুনি—এই মুহূর্ত্তে—চক্ষের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে ওরা একসঙ্গে জনসাধারণের ঘাড়ের ওপর প'ড়ে টুঁটি ধ'রবে চেপে—জীবন দেবে শেষ ক'রে।

মুখ দিয়ে তখন একটা 'রা' বের ক'রবারও অবসর দেবে না, এমনি ভয়ঙ্কর।

এন্টনিয়ো ষ্টুকি চীৎকার ক'রে ওঠে, বিচারপতির ধ্বংস হোক! বোলোরোসো খাঁচার গরাদের ওপর মুখ রেখে বানরের মতো দন্ত বিকশিত ক'রে বলে, শালা খেঁকি কুকুরের দল! জনসাধারণ ভয়ে ভীষণ চীৎকার ক'রে ওঠে:—কয়েদ ঘরে নিয়ে যাও, কয়েদ ঘরে নিয়ে যাও।

পুলিশ ছুটে আসে। বিচারপতির আদেশে তারা কয়েদীদের গারদে নিয়ে যায়। কিন্তু যাবার সময় গিগির গগনভেদী চীৎকার কানে আসে:—খুন্ ক'রবো। গিউলিয়াকে খুন্ ক'রবো। আমার হাত থেকে ও নিস্তার পাবেনা কখনো। খুন—খুন! শ্বাসরোধ ক'রে খুন। গিউলিয়া, এই আমার প্রতিশ্রুতি।

* *

*

মর্ম্মান্তিক দৃশ্য! গিউলিয়ার হৃদয়খানা একটা অব্যক্ত বেদনাভারে একেবারে মুহ্যমান। তার মাথা ঘুরে উঠ্‌লো। চোখের সুমুখে কিছু দেখা যায় না। সব যেনো একটা অন্ধকার-পিণ্ডে পরিণত হ'য়ে ওকে পাতালদেশে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যেতে লাগলো। গিউলিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে বারান্দার একটা রেলিং নিজের কম্পিত হাত দিয়ে চেপে ধ'রতে গেলো, কিন্তু পারলো না। ওর জানুদেশ

থর-থর ক'রে কাঁপতে লাগলো। ঘুরে যাচ্ছিলো প'ড়ে। কিন্তু ওর পাশের একটি লোক ধ'রে ওকে পতন থেকে রক্ষা ক'রলো।

—চার—

গিউলিয়ার প্রেমিক আগোফিলেটি। আজ কিছুদিন হ'লো তিনি রোগ-শয্যায় শায়িত। তাঁর নিরাময় আসন্ন। হয়তো আজ কি কাল সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে শয্যা পরিত্যাগ ক'রবেন। কিন্তু এখনো কিছু দৌর্বল্য ওঁর সারা দেহটায় পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছে। গিউলিয়ার আদালতে সাক্ষ্য প্রদান কালে তিনি আদালতে যেতে পারেন নি। পারেন নি, তাঁর পীড়ার জন্যে। কিন্তু প্রতিদিন তিনি সংবাদপত্র মন দিয়ে পড়তেন। কাজেই ব্যাপারটা তাঁর অজানা ছিলো না।

আরোগ্য লাভ ক'রে আগোফিলেটি একদিন গিউলিয়ার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। কিন্তু মেয়েটির কৃষ্ণবর্ণ পোষাক আর অশ্রু-পূর্ণ চোখ দেখে তাঁর নিজেরও বড়ো কষ্ট হ'তে লাগলো। কিন্তু সেই দুর্ব্বল ভাবটা মন থেকে অপসারিত ক'রে দিয়ে গিউলিয়াকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্লেন, দুঃখ ক'রো না। দুর্ভাগ্যবশতঃ তুমি ঐ রকম ভাই পেয়েছো। তুমি তো তাদের বেছে নাও নি। তোমার ভাগ্যই ওদের তোমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ছিলো। কিন্তু তুমি নিঃসন্দেহ হ'তে পারো—এর জন্যে তোমাকে আমি বিন্দুমাত্রও দোষ দিই নে। শেষে কিন্তু সব ভালোই হবে।

গিউলিয়া ব'ল্লো, সত্যি—সব ভালোতে 'শেষ' হবে – হ্যাঁ ?

—অস্থির হও না। তোমার ভাই যদি সৌভাগ্যবান পুরুষও হয়, তবে ত্রিশ বছর সশ্রম কারাবাসের আগে খালাশ পাবে না। এটা ঠিক্ জেনো। এই ব'লে আগোফিলেটি দাঁত বের ক'রে হাসতে লাগলেন।

গিউলিয়া একটা ইজিচেয়ারে শুয়েছিলো। আগোফিলেটির কথায় সর্প দংশিতের মতো উঠে ব'সলো। চোখ দু'টি অসম্ভব বিস্ফারিত ক'রে ব'ল্লো, এ'-কথা তুমি আমায় হাসি মুখে শোনাতে পারলে ? তোমার এতো বড়ো সাহস ?

ওর এই উচ্ছ্বাসে আগোফিলেটির বিস্ময়ের অবধি রইলে না। শান্তকণ্ঠে ব'ল্লেন, সে জেল থেকে ফিরে এসে আবার তোমার সঙ্গে বাস ক'রবে—এই কি তোমার ইচ্ছে ?

গিউলিয়া বিদ্রূপ পূর্ণ-স্বরে ব'ল্লো, তাই যদি হয়, তবে—তবে সেটা কি তোমার খুব আশ্চর্য্য ব'লে মনে হবে ?

যুবকটি প্রত্যুত্তরে কিছু না ব'লে বাতায়নের ভেতর দিয়ে বাইরের উদ্যানের দিকে ক্ষণকাল নিঃশব্দেই চেয়ে রইলেন। তারপর একসময়ে গিউলিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'ল্লেন, মাথা ঠাণ্ডা করো। ভালো ক'রে বুঝে দেখো। ওর ফিরে আসাটা আমাদের উভয়ের পক্ষেই কতো বড়ো ভয়ের ব্যাপার। সে তো তোমাকে খুন ক'রবে ব'লে শাসিয়েছে !

শুনে গিউলিয়া পুনরায় ইজিচেয়ারটার ওপর নিজের দেহখানি একান্তে ন্যস্ত ক'রলো। ওর সমগ্র মুখখানা একটা নিদারুণ ঔদাসীন্যে

ও রিক্ততায় ছাপা-ছাপি হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু এইটাই আগোফিলেটি গিগির চক্-চকে ধারালো ছোরার চেয়ে ভয় ক'রতেন। কাজেই গিউলিয়াকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে, বেশ বিনয় এবং নম্রসূচক কণ্ঠে ব'ল্লেন, তুমি অস্বীকার ক'রতে পারো না,—তোমার ভাই গিগি, ওরফে পিভিয়ন, একটা অত্যন্ত রাগী এবং বদমেজাজের লোক। অবশ্য এটা ঠিক্ তার দোষ নয়। দোষ সময়ের—প্রতিকূল সময়ের। অন্য যে কেউ, পিভিয়নের মতো অবস্থায় পড়লে, হয়তো আরো খারাপ কাজ ক'রে ব'সতো। নয় কি?

মেয়েটি বাধা দিয়ে ব'ল্লো, আপনাকে অনুরোধ ক'রছি, সাংসারিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা ক'রবেন না।

কিন্তু আগোফিলেটি ওর অনুরোধে কর্ণপাত না ক'রে, ব'লে যেতে লাগলেন, তোমাদের বংশকে আমি যথেষ্টই সম্মান দি'। তোমাদের বংশ আমার সম্মানার্হ।

ব'ল্লেন, তত্রাচ আমি চাইনে যে, তোমার ভাই এখুনি বাড়ী ফিরে আসুক। হয় তো আমি ভুল ক'রছি। কিন্তু এটা আমার অনেক চিন্তার ফল।

গিউলিয়া ক্রোধ প্রকাশ ক'রে ব'ল্লো, কিন্তু আমার প্রতি কি কোনো কর্ত্তব্য তোমার নেই? আমার ভাইয়ের খালাশের জন্যে তোমার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। উকিল, জুরী, এমন কি জজের কাছে গিয়েও তোমার ওর খালাশের জন্যে অনুরোধ করা উচিত। তাদের সকলকে জানতে দাও যে, আমার ভাইয়ের দুর্ভাগ্যে সমবেদনা জানাতে, অন্ততঃ, একজন ধনী লোকও বেঁচে আছে। আগোফিলেটি,

তুমি আমায় ভালোবাসো। এই ভালোবাসার ওপর নির্ভর ক'রে তোমাকে ব'লছি—তোমার কর্ত্তব্য তুমি করো।

আগোফিলেটি তার উক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছেন ব'লে মনে হলো না। কিন্তু যেনো তাঁর কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রতে যাচ্ছেন, এমনি ভাব দেখিয়ে গিউলিয়ার মুখপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রলেন। এবং একটু পরেই তাঁর হাতের মধ্যে গিউলিয়ার হাতখানি অনুরাগভরে চেপে ধ'রে ব'ল্লেন, যাচ্ছি—এখুনি আমি যাচ্ছি। ওতো সামান্য ব্যাপার। এমন কি শক্ত, এমন কি শক্ত?

গিউলিয়া ব'ল্লো, আমার মনে হয়, একটু চেষ্টা ক'রলেই আমরা ওকে বাঁচাতে পারি। সংবাদপত্রে আমার বিশ্বাস নেই। আমার ভাই চোর—এ আমি কখনো বিশ্বাস ক'রিনে।

—এখুনিই গিয়ে সব ব্যবস্থা ক'রছি। আজই সন্ধ্যার আগে সুসংবাদ নিয়ে আসবো। তুমি আমার ডিনারের বন্দোবস্ত ক'রে রেখো। দু'-জনে একসঙ্গে আহার ক'রবো—বুঝলে?

এই আশার বাণী গিউলিয়ার কানে যেনো সুধা বর্ষণ ক'রলো! আনন্দের আতিশয্যে সে ওর প্রেমিকের দিকে নিজের একখানা হাত প্রসারিত ক'রে দিলে। সমস্ত মুখখানা নির্ম্মল সারল্যপূর্ণ-হাস্যে উদ্ভাসিত ক'রে তাঁকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ব'লে উঠলো, আগোফিলেটি, তোমার দয়ার তুলনা মেলে না। তুমি সত্যি অনন্য-সাধারণ। আজ ঈশ্বর তোমার সহায় হবেন। আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো কিন্তু।

কিন্তু কী হতভাগ্য ঐ গিউলিয়া! প্রতিদিন ও প্রতীক্ষায় ব'সে থাকে। এই বুঝি তার ভাইকে নিয়ে আগোস্তিনোটি ফিরে আসে! কিন্তু কোথায় কে?

এমনি কয়েকদিন প্রতীক্ষায় থেকে গিউলিয়া আর স্থির থাকতে পারলে না। অবশেষে বিচারের শেষদিনে পরিচারিকাকে সঙ্গে ক'রে আদালত-কক্ষে এসে হাজির হ'লো।

আদালতের উকিল তখন কয়েদীদের দিকে দু'হাত প্রসারিত ক'রে উত্তেজনায় ভেঙ্গে প'ড়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—হ্যাঁ, তুমি, তুমি পিট্রোকারেনাজিও; তুমি, কার্লোপামপেলী। আর তুমি, গিগি ক্যাভেলিয়ারী। তোমরা সকলেই ভালোমানুষ বৃদ্ধ মেটিরোটির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে তাকে হত্যা ক'রেছো। কেন? কারণ সে তার অর্থ, বার্দ্ধক্যবশতঃ রক্ষা ক'রতে অক্ষম ছিলো। অর্থ সঞ্চয় ক'রে ছিলো অসাধু উপায়ে নয়। একদিনেও নয়। সে তার সঞ্চিত অর্থ শুধু নিজের স্বার্থেই ব্যয় ক'রতো না। বহু দীন-দরিদ্র ব্যক্তিকেও সে অর্থ বিতরণ ক'রতো। জুরীগণ, আপনারা একবার ভেবে দেখুন! কী নৃশংস হত্যাকাণ্ড ওরা সম্পাদন ক'রেছে। এই হত্যাকাণ্ড যে হঠাৎ অবস্থার বৈগুণ্যে ঘটেছিলো তা' নয়। কথনো তা' নয়। ঐ দুরাচার, বর্ব্বর, সানন্দ সঙ্ঘের সমস্ত সদস্যরাই তাদের অন্তর্নিহিত নৃশংসতায়, এবং পৈশাচিকতায় ঐ হত্যাকাণ্ড স্বেচ্ছায় সম্পাদন ক'রেছে।

দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে আদালতপক্ষের উকিল যথাস্থানে উপবেশন ক'রলেন। জজসাহেব চিরচরিত প্রথানুযায়ী জুরীদের সঙ্গে বহুক্ষণ পরামর্শ ক'রে কিছুক্ষণের জন্য আদালতের কাজ বন্ধ রেখে বিশ্রাম

ক'রতে বিচার-কক্ষ পরিত্যাগ ক'রলেন। জুরীরাও তাঁকে অনুসরণ ক'রতে বিস্মৃত হ'লো না।

আর গিউলিয়া? সে যে কতক্ষণ আনতমুখে এবং অশ্রুপূর্ণ চক্ষে পাষাণের মতো নীরবে ব'সে ছিলো, নিজেরই জ্ঞান ছিলো না।

হুঁস হ'লো, যখন জজসাহেব এবং জুরীরা বিচার-কক্ষে পুনরায় প্রবেশ ক'রলেন।

গিউলিয়ার প্রাণ তখন ব'লতে চাইলো, ওগো জজসাহেব! তুমি আমার ভাই গিগিকে চেনো না। সে কখনোই চুরি ক'রতে পারে না। মানুষ খুন ক'রতে পারে না। তুমি ওর প্রতি সুবিচার করো। কিন্তু শত চেষ্টা ক'রেও তার কণ্ঠ হ'তে একটা শব্দও নির্গত হ'লো না। শুধু ও উদাসভরা দৃষ্টিতে বড়ো বড়ো চোখ মেলে বিচারপতির দিকে রইলো চেয়ে।

তারপর? তারপর হঠাৎ একসময়ে ওর কানে এলো বিচারপতির রায়-ঘোষণা:—

গিগি ক্যাভালিয়ারী (পিভিগ্নন), বোলোরোসো, (পিট্রো ক্যারেনাজিও) এবং ষ্টিংঘেলা (কার্লোপামপেলী) আজীবন জেলঘর বাস ক'রবে। এন্‌টনিয়ো ষ্টুকি আর লুইগি মর্ডোনির প্রতি এই সঙ্গে ত্রিশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হ'লো।

বিচারপতির আদেশে প্রত্যেক কয়েদীকে পুলিশ জেলখানায় নিয়ে গেলো।

গিউলিয়া পাষাণ, ঠিক নিথর পাষাণের মতো ব'সে রইলো।

গিগির গমন সময়ে সে একটা দৃষ্টিও ওর মুখে ফেলতে পারলে না; সে এখন শুধু সেই শূন্য কয়েদীর খাঁচাটার পানে রইলো চেয়ে।

একসময়ে সঙ্গের পরিচারিকা ওকে ডেকে আদালত-কক্ষ পরিত্যাগ ক'রে যাবার জন্যে অগ্রসর হ'লো। গিউলিয়া কলের পুঁতুলের মতো সিঁড়ি বেয়ে নীচে এলো নেমে এবং পথে পদার্পণ ক'রবার দরজা পার হ'তেই, ওর দৃষ্টি-পথে প'ড়লো—আগোফিলেটির নিজের ঘোড়ার গাড়ী। তিনি গাড়ীতে ওঠবার জন্যে ওকে নির্ব্বাক্যে ইঙ্গিত ক'রলেন।

গাড়ীতে ওরা তিনজনে উঠে ব'সলো। আগো, গিউলিয়াকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে আর্দ্র স্বরে, সত্যি—আর্দ্র স্বরে ব'ল্লেন, কী দুর্ভাগ্যের ব্যাপার!

গিউলিয়ার চোখের কোণ বেয়ে এবার শ্রাবণের ধারার মতো অশ্রু নিঃশব্দেই গ'ড়িয়ে প'ড়তে লাগলো। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ব'ল্লো, আর তাকে আমি দেখতে পাবোনা—চিরদিনের মতো তাকে দেখতে পাবো না! গিগি, গিগি—আমার ভাইরে!

—কী দুর্ভাগ্যের কথা!

আগোফিলেটি আজ গিউলিয়ার চোখে জল দেখে এবং তার অন্তরের বেদনা উপলব্ধি ক'রে প্রকৃতই আন্তরিক ব্যথিত হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু এখন তাঁর করবার তো কিছু নেই! যখন করার তাঁর ছিলো, তখন তো কিছুই তিনি করেন নি!

গিউলিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলো, গিগির জন্যে আর কিছুই কি করা যায় না? কিছুই করা যায় না?

আগোফিলেটি এর উত্তরে কোনো কথা ব'লতে পারলেন না। শুধু গিউলিয়াকে নিজের দিকে আর একবার টেনে নিয়ে ওর কেশের ভেতর অঙ্গুলি সঞ্চালন ক'রতে লাগলেন।

*　　*　　*　　*　　*　　*

গাড়ী এসে থামলো। থামলো গিউলিয়ার বাড়ীর দরজায়। তিনজনেই একে একে নেমে প'ড়লো।

গিউলিয়া আগোকে লক্ষ্য ক'রে সজলচক্ষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'ল্লে, কিন্তু তখন আমি সত্যি কতো সুখী ছিলাম!

আগোফিলেটি ওকে হাত ধ'রে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তখন—কখন বলো তো?

—যখন আমি আমাদের সেই সামান্য, অতি সামান্য ঘরে আমার মা'র সঙ্গে থাকতাম। গরীব ছিলাম। কিন্তু নিজে খেটে খেতাম। এই বিচিত্র জগতের কুটিলতা আমার জানা ছিলো না। তখন গিগি আমার জন্যে প্রতিদিন কতোই না ফুল আনতো!

—কিন্তু সে তো চুরি ক'রতো।

—আমি তার কিছুই জানতাম না। আমি সুখী ছিলাম—হ্যা নিশ্চয়ই সুখী ছিলাম!

এই ব'লে গিউলিয়া নিজের হাত দু'টির মধ্যে তার অশ্রুধৌত মুখখানি ঢেকে ফেল্লে। কাঁদতে-কাঁদতে অস্ফুটস্বরে বারংবার ব'লতে লাগলো, গিগি—দাদা আমার!